পঞ্চম অধ্যায়

# সাতের দশকের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চিত্র বাংলা নাটকে

# সাতের দশকের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চিত্র বাংলা নাটকে

সাতের দশকের রাজনীতি শুরুই হয়েছিল প্রধানত কতগুলি পার্টির রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংঘাত দিয়ে—সে কথা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়েই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। একদিকে শাসক কংগ্রেস ও সি. পি. আই. (এম) প্রথম থেকেই সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রত্যেকটা নির্বাচনে এই দুই দল মূলত চিরতরে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী থেকেছে। ফলে প্রথম থেকেই দেখতে পাই এদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই। সেই লড়াই বেশিরভাগ সময়েই পৌঁছাত হিংসাত্মক পর্যায়ে। এর উপরে আবার এসেছিল সি. পি. আই. (এম, এল) পার্টি। নকশাল আন্দোলনের মধ্যে যার বীজ নিহিত। এরা নিজেদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখে এবং সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কংগ্রেস ও সি. পি. আই. (এম) উভয় পার্টিকে নিজেদের শত্রু মনে করে। এরা চেয়েছিল অতি দ্রুত বিপ্লব আনতে। আর সেই বিপ্লবের পথে যারাই বাধা দেয় তারাই হয়ে উঠে এদের কাছে শত্রু। ফলে সাতের দশকের রাজনীতি এই তিন পার্টির ক্ষমতা দখলের রেষারেষিতে পড়ে এক বিশৃঙ্খল, অস্থির ও সন্ত্রাসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। ১৯৭২ নাগাদ নকশাল আন্দোলন ক্রমশ মাটি হারাতে থাকে। আর এই সময়েই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে স্বমহিমায় আবির্ভূত হন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ১৯৭২-এর বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যায় লাগামছাড়া সন্ত্রাস ও রিগিং। সারা রাজ্যজুড়ে শুরু হয় সমাজবিরোধীদের উচ্ছৃঙ্খলতা। এই সন্ত্রাসে প্রাণ হারায় বেশ কিছু নাট্য-ব্যক্তিত্ব। যেমন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পানিহাটী শাখার প্রতিষ্ঠাতা সরল রায় ১৯৭০ সালের ২৮ অক্টোবর নকশালপন্থীদের হাতে খুন হন, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার খড়দহ গণনাট্য শাখার সভ্য অনিল পাত্র ১৯৭১ সালের ৩১ মে নকশালদের হাতে খুন হন, প্রবীর দত্ত ১৯৭৪ সালের ২০ জুলাই 'ভিয়েতনাম দিবস' পালন করতে গিয়ে কলকাতার কার্জন পার্কে পুলিশি সন্ত্রাসে প্রাণ হারান।[১] এরকম সন্ত্রস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সে সময়ের কিছু নাটককার নিজেদের নাটকে তুলে ধরেছেন। যেগুলির মাধ্যমে খুব সোচ্চারে ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধের দেওয়াল গাঁথা হয়েছিল।

**ব্যারিকেড :**

১৯৩৩ সালের জার্মানির রাজনীতিতে অ্যাডলফ হিটলার ও তাঁর নাৎসি পার্টির উত্থানের পটভূমিকে বিষয় করে ১৯৭২ সালে উৎপল দত্ত রচনা করেন 'ব্যারিকেড'। পিপলস লিটিল থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনায় নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে।[২] ইয়ান পেটার্সনের বার্লিনের রোজনামচা 'Unsere Strasse' বা 'আমাদের রাস্তা' গ্রন্থ থেকে নাটকটির বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে। তবে জার্মানের পটভূমিকায় কাহিনি গড়ে উঠলেও একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সবদিক থেকে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ফ্যাসিস্ট আদলে ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর কংগ্রেসের উত্থানই হয়ে উঠেছে নাটকটির নাট্যভাষ্য। এখানে তিনের দশকের জার্মানিই হয়ে উঠেছে সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গ। নাটকের সূত্রধার বাঙালি শ্রমিক আর এক বাঙালি শ্রমিককে তাই বলছে—

> 'রে মূঢ়, নিজের কথা ভাব, স্বদেশের কথা চিন্তা কর। ১৯৩৩-এর জর্মন জনগণের কথা তোকে চিন্তা করতে হবে না।'[৩]

কাহিনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

'প্রস্তাবনা' অংশ দুজন বাঙালি শ্রমিকের কথোপকথন দিয়ে শুরু। তাদের একজন নাটকের সূত্রধার ও অপরজন শ্রমিক অথচ জাতীয়তাবাদী। দ্বিতীয় জন সমস্ত বিদেশি ভাবধারা বর্জন করতে চায়। তাই নাটকের শুরুতে যখন সূত্রধার লালফৌজের গান গাইছিল তখন তাকে দ্বিতীয়জন নজরুল গীতি গাইবার পরামর্শ দেয়। সূত্রধার তাকে বোঝায়, শ্রমিকের কোনো দেশ নেই, কোনো জাতি নেই; পৃথিবীটাই তাদের দেশ এবং সব জায়গার শ্রমিকের জাত এক—তারা শ্রমিক। এরপর সূত্রধার দর্শকদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নাটকের মূল চরিত্রগুলির সঙ্গে। যারা প্রত্যেকেই জার্মানি। য়োহান লিপার্ট নাৎসি পার্টির একজন কর্মী; যে মনে করে হিটলারের নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানিতে দেশীয়ভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। হেরমান স্ট্রুবেল একজন ডাক্তার তথা সমাজের বুদ্ধিজীবী; কিন্তু ১৯৩৩-এর জার্মানির রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিবেশে সে আর ডাক্তারি করতে বেরোয় না। বর্তমান রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে ঘরে বসে সে বিগত শতকের বই পড়ে। হাইনরিস লাণ্ট জার্মানির নিরপেক্ষ সংবাদপত্র 'ফ্রাইয়ে ৎসাইটুং'-এর

সম্পাদক ও মালিক এবং অটো বিরখোলৎস সেই পত্রিকার একজন রিপোর্টার। বিচারপতি আলবার্ট ফস মনে করে আদালত রাজনীতির বাইরে। যদি কেউ দোষ করে তো আদালত তার শাস্তি দেবে, সেখানে কোনও রাজনীতি নেই। ইংগেবর জননেতা য়োসেফ ৎসাউরিৎস-এর স্ত্রী। সে মনে করে সাধারণ মানুষের রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই ভালো। অথচ তার পালিত পুত্র পাউল শাল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং বর্তমানে সে ফেরার। এভাবেই বুদ্ধিজীবী, বিচারপতি, সাংবাদিক, সাধারণ মানুষ নিজেদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। যা স্বৈরাচারী শাসকের স্বৈরতন্ত্রকে আরও দৃঢ় করে তোলে। 'প্রস্তাবনা' অংশেই জানতে পারি রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে জার্মানিতে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে, প্রতিনিয়ত নাৎসি বনাম কমিউনিস্টদের মধ্যে মারামারি চলছে, রাষ্ট্রপতি হিটলারকে সরকার গঠনের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে। যার মধ্যে ১৯৭১, ১৯৭২ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের সাদৃশ্য অনুভব করা যায়।

জার্মানির পটভূমিতে নাটকের মূল কাহিনি ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়। যেদিন হিটলার প্রধানমন্ত্রী হন। শুরুতেই অটোর দীর্ঘ সংলাপে জার্মানির তৎকালীন পরিস্থিতির জটিলতা ধরা পড়ে। গত ছয় মাসে ৪৬১টা খণ্ডযুদ্ধ এবং এক মাসে ৮৩টি রাজনৈতিক খুন হয়েছে। শহরের রাস্তায় যেখানে সেখানে পড়ে আছে সদ্য খুন হওয়া রাজনৈতিক কর্মীর দেহ। পুলিশের হাজতে বিপ্লবী ছাত্রদের ওপর চলছে নৃশংস অত্যাচার। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে কোনো সরকারই স্থায়ী হতে পারছে না। মাত্র তিন বছরে পাঁচবার নির্বাচন হয়েছে—১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩০, মার্চ ১৯৩২, ১০ এপ্রিল ১৯৩২, ৩১ জুলাই ১৯৩২ এবং ৬ নভেম্বর ১৯৩২। এতবার নির্বাচনের কারণ বারবারই শ্রমিক পার্টিগুলির কাছে হিটলারের পরাজয় হওয়া। ফলে অশান্তি সৃষ্টি করে প্রত্যেকবার মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়া হয় যাতে পরের নির্বাচনে হিটলার ক্ষমতা দখল করতে পারে। ঠিক যেমন পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত মোট চারবার নির্বাচন এবং তিনবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। আর সে সঙ্গে চলে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, নির্বাচনে নির্বিচারে রিগিং। এই পরিস্থিতি ততদিন বহাল থাকে যতদিন না রাজ্য-ক্ষমতা কংগ্রেস দখল করছে। নাটকেও দেখি পঞ্চম নির্বাচনেও হিটলার তা পারেনি, অথচ রাষ্ট্রপতি অবৈধভাবে হিটলারকে প্রধানমন্ত্রী করে, আইনসভা ভেঙে দিয়ে পরবর্তী নির্বাচন ঘোষণা করে ৫ মার্চ ১৯৩৩ এবং পরবর্তী নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত হিটলারই থাকবে কার্যকরী প্রধানমন্ত্রী। আসলে এর পিছনে

ছিল জার্মানির রাজনীতি থেকে কমিউনিস্টদের সমূলে উৎখাত করার অভিসন্ধি। এদিকে যোসেফ ৎসাউরিৎস খুন হয়েছে। আর চেষ্টা করা হচ্ছে কমিউনিস্টরাই এই খুন করেছে বলে প্রচার করার। সেরকমই পশ্চিমবঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হেমন্ত বসুর হত্যার দায় সি. পি. আই. (এম.)-এর উপর চাপানোর চেষ্টা হয়েছিল। সেখানে সংবাদপত্র হয়ে ওঠে সেই প্রচারের একটি মাধ্যম। 'মিডিয়া ট্রায়াল'-এর মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। কারা খুন করেছে তা প্রমাণের আগেই 'ফ্রাইয়ে ৎসাইটুং'-এর সম্পাদক লাণ্ট সংবাদের শিরোনাম লিখে ফেলে—'আশি বছরের বৃদ্ধ জননেতাকে কুপিয়ে হত্যা করে রাজপথে কমিউনিস্টদের নৃত্য'[৪] এবং অটোকে নির্দেশ দেন তথ্য-প্রমাণ অন্য কথা বললেও শিরোনাম অনুযায়ী প্রতিবেদন লিখতে।

সংবাদ মাধ্যমের তথ্য-প্রমাণ যাচাই না করে সংবাদ পরিবেশন করা ফ্যাসিস্ত শক্তির হাতই শক্ত করছে। অন্যদিকে লিপার্টের মতো নাৎসি পার্টির কর্মী বিভিন্ন জনসভায় এই খুনের মামলায় কমিউনিস্টদের দায়ী করছে। আবার পুলিশও হয়েছে তাদের আর এক হাতিয়ার। কিছু প্রমাণ সাজিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির শার্লোটেনবুর্গ জেলার সম্পাদক রিখার্ড হুটিগ-কে আটক করে। যাকে তিনদিন পর আদালতে তোলা হবে। এই খুনকে হাতিয়ার করে হিটলারের নাৎসি পার্টি পরবর্তী নির্বাচনে জনগণের কাছে ভোট চায়—

> 'শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়তে হবে এক নেতার পেছনে এক প্রাণ, এক জাতি, সে নেতা আডল্‌ফ হিটলার। আমাদের পার্টি নাৎসি পার্টি। অর্থাৎ নাসিওনাল সোৎসিয়ালিস্ট পার্টিই। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র এ দুই আমাদের মন্ত্র। জার্মানিকে জাতীয়তাবাদের দুর্গ করে গড়তে হবে, মহান নেতার হাত শক্ত করতে হবে, জার্মানিকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। আডল্‌ফ হিটলারের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র আসছে। নাৎসি পার্টিকে ভোট দিন।'[৫]

যোসেফ ৎসাউরিৎসকে যে কমিউনিস্টরাই মেরেছে একথা ইংগেবরও বিশ্বাস করে। যদিও সে কাওকে সনাক্ত করতে পারেনি। কিছু অনুমানের মাধ্যমে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। যেমন 'কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ' স্লোগান, একে অপরকে 'কমরেড' সম্বোধন করা ইত্যাদি। অটো যখন তার সাক্ষাৎকার নিতে আসে তখন তাকে সেই সব অনুমানের

কথা বলে। অটো আসার পূর্বে তার পালিত পুত্র পাউলের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয় তা সেই সময়ের উদভ্রান্ত রাজনীতিকে দর্শায়। ইংগেবর পাউলকেও দোষী মনে করে; কারণ সে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। আর বর্তমান রাজনীতিতে পাউল তথা তার পার্টি শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। যোসেফ ৎসাউরিৎস খুনের কিছু পূর্বেই কমিউনিস্টরা লুডভিগ মাইসনারকে খুন করেছিল। কারণ সে নাৎসি দলের একটা গুন্ডা ছিল এবং সে পাঁচজন কমিউনিস্ট কর্মিকে খুন করেছিল। তাই পাউল নির্দ্বিধায় বলতে পারে—

> 'জীবনকে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে আলাদা করে আমরা দেখি না। একটা যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধে মালিক যখন শ্রমিককে খুন করায়, সেটা অপরাধ। কিন্তু শ্রমিক যখন তিনশ বছরের শোষণের জবাবে মালিকের পোষা গুণ্ডাকে হত্যা করে, সেটা আত্মরক্ষা, সেটা ন্যায়বিচার।'[৬]

বুঝতে অসুবিধা হয় না এই সমস্ত সংলাপ ও ঘটনার মধ্য দিয়ে সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গে নকশাল রাজনীতির শ্রেণিশত্রু খতমের সাদৃশ্য তুলে ধরতে চেয়েছেন নাটককার।

নাটকের চতুর্থ দৃশ্যে হুটিগের প্রাথমিক বিচার শুরু হয়। স্ট্রুবেল ও ইংগেবর সাক্ষ্য দেয়। যোসেফ ৎসাউরিৎস-এর হত্যা মামলায় এরাই ছিল প্রত্যক্ষদর্শী। তবে এই খুন যে কমিউনিস্টরাই করেছে এবং সেই খুনিদের মধ্যে হুটিগও ছিল কি না এ ব্যাপারে দুজনেই নিশ্চিত ছিল না। কারণ তারা দুজনেই দূর থেকে খুন হতে দেখায় কাউকে সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারেনি। আগেই বলেছি এই সময় পুলিশ সম্পূর্ণভাবে শাসক অর্থাৎ নাৎসিদের হয়ে কাজ করছিল। কমিউনিস্টদের নিশ্চিহ্ন করতে পুলিশও হয়ে উঠেছিল শাসকের হাতিয়ার। এই দৃশ্যে দেখি, গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ক্যাপ্টেন হেস প্রমাণ হিসেবে হাজির করেছে যোসেফ ৎসাউরিৎস-এর হত্যাকালীন ছোরা, রক্তমাখা কোট ও প্রচারপত্র এবং দাবি করে সেগুলি হুটিগের আস্তানা থেকে উদ্ধার হয়েছে। এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণে হুটিগ-এর বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে এখনও তার বিচার সমাপ্ত হয়নি। কিন্তু 'ফ্রাইয়ে ৎসাইটুং'-এর মতো সংবাদপত্র বিচার শেষ না হওয়ার আগেই তাকে খুনি ঘোষণা করে দেয়। এই দৃশ্যে সংবাদপত্রের ঘৃণ্য সাংবাদিকতার স্বরূপ ধরা পড়েছে। দেখানো হয়েছে শাসকের তল্পিবাহকতায় কীভাবে কথার মারপ্যাঁচে সংবাদপত্র সাধারণ মানুষকে ভুল পথে চালিত করে।

এরকম সময়ে এগিয়ে আসে অটোর মতো সাংবাদিক। 'ফ্রাইয়ে ৎসাইটুং' পত্রিকায় কাজ করতে গিয়ে সে জানতে পারে এই সব পত্রিকার ভূমিকা। তার বুঝতে বাকি থাকে না এই সব পত্রিকাগুলি আসলে নাৎসিদের এজেন্ডাকেই সার্থক করতে ব্যস্ত। যথাযথ সংবাদ পরিবেশন করায় তাদের কোনও স্পৃহা নেই। এখান থেকেই একজন সৎ সাংবাদিকের দায়বদ্ধতায় অটো যোসেফ ৎসাউরিৎস-এর হত্যাকাণ্ডের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য যাচাই করার কাজে মনোনিবেশ করে। এর জন্য সে যেমন ইংগেবর ও স্ট্রুবেলের সাক্ষাৎকার নিয়েছে, তেমনি গোপনে কমিউনিস্টদের বক্তব্যও শুনেছে। আর কমিউনিস্টদের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েই সে জানতে পেরেছে কমিউনিস্টদের উপর নাৎসিবাহিনী ও পুলিশ যৌথ উদ্যোগে নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে। ৎসাউরিৎস-এর হত্যাকে সম্বল করে নাৎসীদের চক্রান্তের কথা কমিউনিস্ট কর্মী ফ্রান্ট্স্ ৎসান্ডের-এর সংলাপে উঠে আসে—

> 'নির্বাচনে আমাদের হারাবার জন্য। দ্বিতীয়ত ৎসাউরিৎস-হত্যার অজুহাতে এ অঞ্চলে পুলিশ এবং গুন্ডার প্রবেশের পথ প্রশস্থ করতে। বাইরে বেরুলেই দেখতে পাবেন পুলিশের কড়া পাহারায় মস্তানের দল ক্যাম্প করে বসে গেছে ভালট্রাসেতে। এ ক'দিনে আমাদের পনেরো জন সদস্যকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মেরেছে, গ্রেপ্তার করেছে উনচল্লিশজনকে। এ পাড়া থেকে আমাদের নির্মূল করতে চাইছে।'[৭]

পাউলের সঙ্গে কথা বলে অটো জেনেছে এ পর্যন্ত দেড় হাজার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য খুন হয়েছে এবং নিরাপত্তা আইনের বলে গ্রেপ্তার হয়েছে পাঁচ হাজারের ওপর। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ থানায় অত্যাচারের বর্ণনা উঠে আসে হাইনৎস প্রয়েস-এর সংলাপে—

> 'থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করে, মুখে ঘুষি মারে, জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরেছিল এইখানটায়। তারপর নিয়ে যায় শার্লোটেনবুর্গ পুলিস সদর দপ্তরে। সেখানে ক্যাপ্টেন হেস নিজে আমাকে উপুড় করে শুইয়ে গুহ্যদ্বারের মধ্যে লোহার মোটা রড পুরে দেন—বার বার। তার পর চার জনে মিলে ছুঁড়ে মারে দেয়ালের গায়ে। এই চলে তিন দিন তিন রাত্রি।'[৮]

এই সব তথ্য নিয়ে অটো বিচারপতি ফসের চেম্বারে তারই সহায়তায় গোপনে অধিবেশন ডাকে। উপস্থিত থাকে বিচারপতি স্বয়ং এবং ইংগে, লান্ট, হেস ও স্ট্রুবেল। এখানেই অটো তার সংগ্রহ করা সমস্ত তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেয় যোসেফ ৎসাউরিৎস-এর হত্যাকাণ্ডে হুটিগ বা কমিউনিস্ট পার্টির কোনও যোগ নেই। সেসব তথ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বিচারপতি হুটিগকে বেকসুর খালাস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরকম পরিস্থিতি আসতে পারে নাৎসিরা আগেই অনুভব করতে পেরেছিল। সেজন্য আগেই হুটিগকে তারা নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় প্লোটজেনেজে কারাগারে নিয়ে যায়—সুতরাং বিচারবিভাগের হাতে আর সেই মামলা থাকে না। ফসেরও বুঝতে বাকি থাকে না আসল দোষী কারা, বিচারবিভাগের উপর নাৎসিদের এরকম হস্তক্ষেপ তাকে হতাশ ও ক্রুদ্ধ করে। সে লিপার্ট ও হেসকে বলতে বাধ্য হয়—

> 'আপনি (লিপার্ট) একটা জালিয়াৎ। ক্যাপ্টেন হেস মিথ্যাবাদী। এই পুরো মামলাটা সাজানো হয়েছিল নির্বাচনী চাল হিসেবে। আমার এ-ও ধারণা জন্মাচ্ছে, সাউরিৎসকে খুন করেছিল হয় শাদা-পোশাকে পুলিস আর নয়তো আপনার নাৎসি গুণ্ডার দল। বিচারপতির উচিত নয় এসব রাজনৈতিক মন্তব্য করা। কোনোদিন করি নি কিন্তু এখন যখন বুঝতে পারছি আপনারা আইনের পবিত্রতা মানেন না, আপনারা ন্যায়বিচারের টুটি টিপে ধরতে চান, তখন আমি মুখ খুলতে বাধ্য। আদালতে উপস্থিত থাকলে শুনবেন কি বলি।'[৯]

এ যেন সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গের জ্বলন্ত চিত্র। জার্মানি ও পশ্চিমবঙ্গ যেন এক জায়গায় এসে মেলে।

৫ মার্চ ১৯৩৩ সালের জার্মানির নির্বাচনের ঘটনাবলি নিয়ে নাটকের অষ্টম দৃশ্য তথা শেষ দৃশ্যটি রচিত। এই নির্বাচনের সঙ্গে ১৯৭২ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের সাদৃশ্য মেলে। ফ্যাসিবাদী শক্তি তার স্বৈরাচারী নীতিকে বাস্তবায়িত করতে ক্ষমতা দখলের উন্মত্ততায় মেতে উঠে, গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করে নির্বাচন ঘিরে সৃষ্টি করে সন্ত্রাসের রাজত্ব। নাটকে দেখা যায় আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে হিটলার ও

নাৎসি পার্টি কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যাতে এই নির্বাচনে জয়ী হতে তাঁকে কোনও বেগ পেতে না হয়।–

১. কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে,

২. ঐ পার্টির সদস্যদের দেখামাত্র গ্রেপ্তার, এমনকি প্রয়োজনবোধে গুলি মারার নির্দেশ জারি হয়েছে,

৩. সর্বপ্রকার ট্রেড-ইউনিয়নের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ,

৪. সর্বপ্রকার কৃষক সমিতি নিষিদ্ধ,

৫. সরকারি কর্মচারী ও ছাত্রদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলন করার অনুমতি নিষিদ্ধ,

৬. জারি হয়েছে জরুরি অবস্থা এবং এই অবস্থাকালীন নাগরিক অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে।

নির্বাচনের দিন চলে নির্বিচারে রিগিং ও ব্যাপক সন্ত্রাস। নির্বাচন কেন্দ্রে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে নাৎসি গুন্ডার দল। এই পরিস্থিতিতে নাৎসি পার্টির সমর্থক হয়েও লান্ট ভোট দিতে পারে না। বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারের থেকে ভোটের সংখ্যা অধিক হয়েছে। এলাকা জুড়ে সংগঠিত সন্ত্রাসের চিত্র ধরা পড়ে ইংগের কথায়—

> ‘এলাকা ঘিরে ঘিরে মারছে, জানেন না? পুলিশ এসে ঘেরে, তারপর নাৎসিরা ভেতরে ঢুকে কমিউনিস্টদের খোঁজে। জানালায় বসে বসে দেখি ছেলেদের দাঁড় করিয়ে গুলি করছে। তারপর এক সময় ওরা পিস্তল উঁচিয়ে বলে, জানালা বন্ধ করুন। তখন বন্ধ করে দিই।’[১০]

হমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে নাৎসিরা বই পোড়ানোর উৎসব শুরু করেছে, স্ট্রুবেল নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা সত্ত্বেও আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। সরকার বিশেষ ক্ষমতাবলে দেশের এগারোটি সংবাদপত্রের প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছে, যার মধ্যে লান্টের ‘ফ্রাইয়ে ৎসাইটুং’ পত্রিকাও বাদ যায়নি এবং বিশেষ আদেশ বলে হুটিগের মামলা চালু রাখতে বলেছে। তবে এবার সেই মামলার বিচারপতি হয়েছে গিওর্গ টাইখার্ট, কারণ

বিচারপতি ফস ভোরবেলায় নৃশংসভাবে খুন হয়েছে। হুটিগের মামলায় সাক্ষী ছিল তিনজন—ইংগে, স্ট্রুবেল ও অটো। আইন অনুযায়ী নতুন বিচারপতির এজলাসে পুনরায় মামলা উঠার দরুন সেই মামলা আবার গোরা থেকে যাচাই হবে। এই স্বৈরাচারী সন্ত্রাসের পরিবেশে অটো ও স্ট্রুবেল সেই মামলায় সাক্ষী থাকতে চায়নি, তবে ইংগে দৃঢ়তার সঙ্গে থেকেছে; সে নিজের প্রাণের ভয় করেনি। কিন্তু তাকে বাগে আনা প্রয়োজন, কারণ সে এখন ৎসাউরিৎস-এর আসল খুনিদের চিনে গেছে। শেষপর্যন্ত পাউলকে হত্যা করে তাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়।

নাটকটির শুরুতে ইয়ান পেটার্সনের বার্লিনের রোজনামচা 'Unsere Strasse' বা 'আমাদের রাস্তা' থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে নাটকের মূল ভাবনা আবদ্ধ—

> 'ফ্যাসিবাদ কী? কিভাবে ধাপে ধাপে ফ্যাশিস্তরা ঝোড়ো মেঘের মতন আচ্ছন্ন করে ফেলে দেশের আকাশ? ডাক্তার, বিচারপতি, গৃহ বধূ, ধর্মযাজক, সাংবাদিক, সর্বপ্রকার বুদ্ধিজীবী কি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে রাজপথের কোলাহল থেকে দূরে থাকতে পারেন? ফ্যাশিবাদ কি রেহাই দেবে কাউকে? জার্মানিতে নাৎসি অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা বলে, শেষ পর্যন্ত ব্যারিকেডে এসে দাঁড়াতে হবে সবাইকে, যদি না বড় বেশি দেরী হয়ে যায়।'[১১]

নাটকেও দেখি ইংগেবর, স্ট্রুবেল, অটো, ফস নিজেদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু ফ্যাসিবাদের আগুনে তারাও দগ্ধ হয়েছে। ফস খুন হয়েছে, ইংগেবর তার স্বামী ও পালিত পুত্র হারিয়েছে, স্ট্রুবেল আক্রান্ত হয়েছে, হুটিগের মামলায় অটো বেশি জরিয়ে পড়ায় তার প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তারা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে, ফ্যাসিবাদের উত্থানে 'আগে মরে কমিউনিস্টরা, তারপর একে একে আসে অন্যদের পালা, তারপর—তারপর একদিন গোটা দেশটাই একটা জেলখানা।'(২৭৮) ফলে নাটকের একদম অন্তিম পর্যায়ে ইংগেবর, স্ট্রুবেল, অটো এসে ব্যারিকেডে দাঁড়িয়েছে কমিউনিস্টদের পাশে।

**দুঃস্বপ্নের নগরী :**

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর থেকে ১৯৭২-এর নির্বাচনের আগে পর্যন্ত সময়পর্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল সেই কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত রচনা করেছিলেন 'ব্যারিকেড' এবং ১৯৭২-এর নির্বাচনের পর সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে পরবর্তী যে আধা-ফ্যাসিস্ত রাজনীতি চলেছিল সেই পটভূমিতে রচনা করলেন 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি। 'পিপলস লিটিল থিয়েটার' কর্তৃক নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৬ মে ১৯৭৪ সালে 'কলামন্দির'-এ।[১২] নাটকটি সম্পর্কে নাটককার বলেছেন—

> 'কলকাতায় কংগ্রেসি গুন্ডাদের কমিউনিস্ট হত্যা এবং সেই কাজে পুলিশ, প্রেস ও তথাকথিত কংগ্রেসি যুবনেতাদের সহযোগিতাকে বিষয় করে লেখা হয় 'দুঃস্বপ্নের নগরী'।'[১৩]

সুতরাং নাটকটির উপর সরকারি আক্রমণ যে অনিবার্য ছিল তা বলাই বাহুল্য। হয়েছিলও তাই।

প্রথম দিন থেকেই নাটকটি মঞ্চস্থ করা নিয়ে বারবার বাধা আসছিল। তবে সুপরিকল্পিত বাধা আসে ২৬ আগস্ট ১৯৭৪ সালে 'স্টার থিয়েটার'-এ।[১৪] বিভিন্ন লেখালেখি, স্মৃতিচারণা, পত্রপত্রিকার পাতা থেকে সেই আক্রমণের চিত্র অনুধাবন করা যায়। উৎপল দত্ত নিজে এই আক্রমণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> 'এক সন্ধ্যায় সেটা ('দুঃস্বপ্নের নগরী') মঞ্চস্থ হওয়ার কথা স্টার থিয়েটারে। উত্তর কলকাতার কুখ্যাত মস্তানরা পূর্বাহ্নেই সেখানে ভিড় করে। আপাদমস্তক সশস্ত্র তারা। মঞ্চকর্মীরা তখন সেট তৈরি করছে। ইন্দিরা গণতন্ত্রের প্রবক্তারা হুরমুড়িয়ে ভিতরে ঢুকে নিরস্ত্র কর্মীদের পেটাতে শুরু করে, সেট গুঁড়িয়ে দেয়, এবং কিছুটা অগ্নিসংযোগ করে। তারপর প্রতিটা দরজা আটকে আমাদের অপেক্ষা করতে থাকে।
>
> সাড়ে তিনটে নাগাদ আমি ওখানে পৌঁছাই। জনতার আতঙ্কিত চিৎকার কানে আসে : ফিরে যান, ফিরে যান। আর বিরাট সশস্ত্র পুলিশবাহিনি তাদের বেষ্টন করে আছে। আমি জনতাকে পাশ কাটিয়ে

ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করি। ওরা আমাকে ধাক্কা দেয় এবং ঘুষি মারতে মারতে রাস্তায় নিয়ে ফেলে। হঠাৎ চোখে পড়ে ভারতের অগ্রগণ্য আলোকশিল্পী তাপস সেনকে একপাল ঠগ মারতে মারতে ভূমিশায়ী করেছে, আর অভিনেত্রী সবিতা ব্যানার্জীর চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচরাতে হ্যাঁচরাতে নিয়ে চলেছে। এলাকার অল্প কিছু মানুষ অবশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু পুলিশ হঠাৎ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ত্যাগ করে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে তাঁদের প্রহার করে। স্পষ্টতই আমরা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলেই, আমাদেরও সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াতে হয়। আমরা তাই ওই স্থান ত্যাগ করি।'[১৫]

শোভা সেনের স্মৃতিচারণায় পাওয়া যায়—

'...কংগ্রেসি গুন্ডারা ও মস্তানরা সেদিন থিয়েটার হল আক্রমণ করার তোরজোড় করছে। আমরাও শো করবই, এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে হাউসে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি, স্টার থিয়েটারের সামনে প্রচণ্ড ভিড়, পুলিশ সমাবেশ, কংগ্রেসি গুন্ডারা ভ্যান নিয়ে প্রস্তুত আমাদের বাধা দেবার জন্য। আগেই কয়েকজন শিল্পী প্রহৃত ও বিতাড়িত। হলের মধ্যে সেট ভেঙে দেবার চেষ্টা, এসবও চলেছে। আমাদের গাড়ি পৌঁছবা মাত্র একদল লোক গাড়ি ঘিরে ধরল। কিছু শুভানুধ্যায়ীও ছিল কাছাকাছি। তারা বলল, 'শিগগির এখান থেকে চলে যান। গুন্ডারা অপেক্ষা করছে আপনাদের মারার জন্য।' আমরা তবুও চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারা গেল না। আমাদের শিল্পী সবিতার মাথায় লাঠি পড়ল। আরো চার-পাঁচজন জখম। তখন অন্য কিছু বন্ধুরা একরকম ঠেলেই আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে একেবারে রঙ্গনা থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে তুললেন। এদিকে স্টার থিয়েটারে আরো গুন্ডা ও মস্তান জড়ো হচ্ছে। পুলিশ তাদের সাহায্য করছে। দর্শকরা দূর থেকে অবস্থা বুঝে ফিরে গেলেন। আমরাও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে উপায়ন্ত না দেখে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হলাম।'[১৬]

৩০ আগস্ট 'দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হয়—

> ‘ঘটনার দিন যুব কংগ্রেস এবং ছাত্রপরিষদের মস্তানরা বেলা তিনটে থেকে স্টার থিয়েটার ব্যারিকেড করে ফেলে। হলের পিছনের দরজায়, সামনের দরজায় এবং অডিটোরিয়ামের ভেতরে লাঠি ও লোহার রড নিয়ে কিছু যুবক মোতায়েন থাকে। তাছাড়া হলের বাইরে ফুটপাতে এবং রাস্তার ওপর কয়েক শো যুবক উত্তেজিত অবস্থায় চারিদিকে পাহারা দেয়। ঘন্টা খানেক পরে বেলা চারটের সময় পি. এল. টি.-র উৎপল দত্ত, শোভা সেন সহ অপরাপর কলাকুশলীরা পেছনের দরজা দিয়ে গ্রিনরুমে ঢুকতে গেলে তাদের টেনে হিঁচড়ে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। আলোকশিল্পী তাপস সেনকে মারধর করে। উন্মুক্ত রাজপথে অভিনেত্রীদের সঙ্গে কয়েকজন মস্তান রীতিমত ধস্তাধস্তি শুরু করে, ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ কাপড়-চোপড় ধরেও টানাটানি করে। সেই সঙ্গে চলে অশ্লীল ভাষায় খিস্তি-খেউড়। এই যুবকদের প্রত্যেকের হাতেই ছিল তেরঙ্গা ঝান্ডা। স্থানীয় জনগণ যাতে পালটা আক্রমণ না করতে পারে, সে জন্য ঝান্ডা গুটিয়ে ফেলে ঐ লাঠিগুলিই পরে কাজে লাগানো হয়। একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল পুলিশ ভ্যান, ওরা একেবারে নির্বিকার।’[১৭]

শুধু আক্রমণেই শেষ হয়নি। তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার বিভূতি চক্রবর্তী উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ চাপিয়ে ১২৪ (ক) ধারায় মামলা দায়ের করেন।[১৮] ২৮ জুন ১৯৭৪ সালে আদালতে পুলিশ তিনটি অভিযোগ জানিয়েছিল—১. ‘The play attacks capitalists’, ২. ‘attacks the police’, এবং ৩. ‘attacks the ruling party’।[১৯]

নাটকটির কাহিনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে। সেই সূত্রেই চিনে নেওয়া যাবে নাটককারের রাজনৈতিক অবস্থান এবং নাটকটি নিয়ে সরকারের ভীতির কারণ।

বিভিন্ন রাজনৈতিক লাইনের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক চেহারা হয়েছিল ভয়ঙ্কর, কলকাতার অবস্থা ছিল সবচেয়ে বেশি আশঙ্কাজনক। নাটককারের কাছে সেজন্য সাতের দশকের কলকাতাকে মনে হয়েছে ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’।

নাটকের মূল কাহিনি শুরুর পূর্বে স্বপন চরিত্র যে গান করে তাতে এই দুঃস্বপ্নের নগরী কলকাতার তৎকালীন পরিবেশ বর্ণিত—

'প্রিয়া আমার নগ্ন আজিকে ধর্ষিতা কৃষ্ণা,
ক্ষুধায় ক্লিষ্ট ছিন্নভিন্ন মুখে তার তৃষ্ণা,
কৌরবে আজ নিংড়ে নিচ্ছে রূপ-যৌবন মান,
খুবলে খাচ্ছে দেহের মাংস রক্ত করছে পান।
রক্তচিহ্ন প্রিয়ার ভালে ক্রোধে সে কম্পিত,
চোখের সামনে মরতে দেখেছে সন্তান শত শত,
তাই যুদ্ধের সাজে সেজেছে প্রিয়া লড়ছে অবিরাম,
কলকাতা আমার প্রিয়ার নাম।'[২০]

নাটকটির পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনুনয় চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

'রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে প্রশাসন, শাসকদল, বিত্তবান শ্রেণী, তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকা, লুম্পেন যুবক ও ভাড়াটে খুনী—একযোগে এই রাজ্যকে এক নৈরাজ্যের অবাধ ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল। কাশীপুর, বারাসাত, বেলেঘাটায় গণহত্যা, জেলের মধ্যে থানার মধ্যে নির্বিচারে হত্যা, অণিমা পোদ্দারের মতো মহিলাদের উপর দৈহিক অত্যাচার, হেমন্ত বসু হত্যা, শত সহস্র কমিউনিস্টদের ঘর বাড়ি, পাড়া এমনকি রাজ্যছাড়া করা হয়েছে। অন্ধকারের সেই কালো দিনগুলো এখনও দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। জীবন জীবিকার আন্দোলন নিষিদ্ধ, গণতান্ত্রিক অধিকার অপহৃত, অলিতে গলিতে খুন, সন্ত্রাস, মৃতদেহের মিছিল—সত্তরের দশকের এই কলকাতায় প্রতিবাদী সংস্কৃতিও ছিল আক্রান্ত। নাটকে অসামান্য দক্ষতায় বিভিন্ন চরিত্রের মুখ ও মুখোশ উন্মোচন করে নাট্যকার ফ্যাসিবাদী শাসকগোষ্ঠীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন।'[২১]

তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত নাটকটির প্রথম দৃশ্যেই তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক জটিলতা ও সন্ত্রাসের যাবতীয় দিক স্পষ্ট হয়েছে। নাটকের পটভূমি ১৯৭৩ সালের কলকাতা। নকশাল আন্দোলন তখন অস্তমিত, রাজ্যে চলছে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমল, কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে একদিকে প্রবল ক্ষমতা নিয়ে অধিষ্ঠিত ইন্দিরা গান্ধি এবং অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক অবনমনে জনগণের সামাজিক জীবনের মান প্রতিনিয়ত তলানিতে ঠেকছে। একদিকে ইন্দিরা গান্ধির সমাজতন্ত্রের বুলি ও জাতীয়তাবাদের হাওয়া বয়ে চলেছে দেশজুড়ে আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনে খাদ্য, কর্মসংস্থানের অভাব বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে—ফলে দেশময় দেখা দিয়েছে গণআন্দোলনের পরিস্থিতি। কলকাতাও তার ব্যতিক্রম নয়। ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে নাটকের কাহিনি শুরু। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের আধিপত্যে মানুষের চাপা আক্রোশের বিস্ফোরণ ঘটে এই নাটকে।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে মজুতদার, কালোবাজারি, ঠিকাদার, ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি লক্ষণ পালিত নিজের ঘরে একটি মিটিং ডেকেছে। সেই মিটিং-এ উপস্থিত হয়েছে ‘বঙ্গবাণী’ সংবাদপত্রের সম্পাদক গোবিন্দ চ্যাটার্জী, পুলিশ কর্তা মৃগাঙ্ক রায় এবং কংগ্রেস নেতা চিন্ময় গোস্বামী। এরা প্রত্যেকেই লক্ষণের টাকায় পালিত হয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠান থেকে লক্ষণকে নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। মিটিং ডাকার মূল কারণ, রাত্রের অন্ধকারে বৃন্দাবন ঘোষ সেকেন্ড বাই-লেনে লক্ষণের এক নম্বর চালের গুদাম লুঠ হয়েছে এবং তিন ও চার নম্বর গুদাম লুঠের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই লুণ্ঠনের নেতৃত্ব দিয়েছে স্বপন ও মুস্তাফার দল—এই ঘটনা মিটিং-এ উপস্থিত সকলের কাছে সব থেকে বড়ো দুশ্চিন্তার বিষয়। কারণ তারা দুজনেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মী-সমর্থকদের পিটিয়ে এলাকা ছাড়া করা হয়েছিল, তারা পুনরায় ফিরে এসেছে, গণসংগঠন করছে এবং প্রচার করছে পুঁজিপতিদের সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাতের কথা। যা ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি দের কাছে যেমন আতঙ্কের বিষয়, তেমনি কংগ্রেস সহ বাকি প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছেও।

মিটিং-এ পারস্পরিক কথোপকথনে উঠে এসেছে সাতের দশকের কয়েকটি জ্বলন্ত ঘটনা—যেমন জেলের ভিতরে, পথে-ঘাটে নকশাল যুবকদের হত্যা, অসীমা পোদ্দারকে ধর্ষণ, হেমন্ত বসুকে হত্যা, ১৯৭২-এর নির্বাচনে সন্ত্রাস ও রিগিং। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই নাটকে উৎপল দত্ত হেমন্ত বসুর হত্যার পিছনে কংগ্রেসের যোগ

দেখিয়েছেন, কিন্তু আসলে তাতে যুক্ত ছিল নকশালরা—সে কথা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়েই আলোচনা করেছি। সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সেসময় সংবাদপত্রও ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করেছিল। সে কথায় উঠে আসে গোবিন্দের উদ্দেশ্যে বলা লক্ষণের সংলাপে—

> ‘পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশে আপনার এই বিষাদ কবে থেকে জাগল? লেক স্টেডিয়ামে নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক উপন্যাসটা ছাপাবার সময়ে কোথায় ছিল? কলকাতার রাজপথে মেয়েরা হাঁটতে গেলেই ধর্ষিতা হয়, এ খবর তো আপনিই ছেপেছিলেন? পুলিশ গিয়ে লোক খুন করে আর আপনি লেখেন—নকশাল আর সি-পি-এম এর ছেলেরা হত্যালীলায় মেতেছে! সারা ভারত সেসব গল্প পড়ে পশ্চিমবঙ্গকে ঘৃণা করতে শিখেছে, বলেছে, বাঙালি নরখাদক বনে গেছে।’[২২]

এই নাটকে সব থেকে বেশি আক্রমণ শানানো হয়েছে পুঁজিপতিদের উদ্দেশ্যে। লক্ষণ পালিতের মধ্য দিয়ে তাদের অভিসন্ধি তুলে ধরা হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাঙার পিছনেও তাদের হস্তক্ষেপ দেখানো হয়েছে। লক্ষণের কথায়—

> ‘পশ্চিমবঙ্গ থাকবে রিক্ত নিঃস্ব এটা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত। পশ্চিমবঙ্গ জোগাবে ইস্পাত, কয়লা, লোহা, পাট, চা, এটা দিল্লীর পলিসি। আর আপনারা কলকাতায় সে-পলিসি কার্যকরী করবেন, তাই আপনাদের গদিতে বসানো হয়েছে। এখান থেকে সব কাঁচামাল নিয়ে যাব আমরা, শুষে নেব, লুঠে নেব—বাধা দিলে একটানে সরকারকে আবার ভুঁইয়ে পাড়ব।’[২৩]

যুক্তফ্রন্ট সরকার এই কাজে বাধা দিয়েছিল বলেই তার পতন ঘটানো হয়েছিল। কংগ্রেসের আমলে সে কাজ যথাযথ গতিতেই সম্পন্ন হচ্ছে; কিন্তু বর্তমানে বাধা দেখা দিয়েছে স্বপন ও মুস্তাফার আগমনে। কারণ এই সরকারের প্রতি জনসমর্থন তেমন নেই, সন্ত্রাসের উপরেই তার ভিত্তিপ্রস্তর নির্মিত। মানুষের সুপ্ত সমর্থন এখনও কমিউনিস্ট পার্টির উপরেই। সুতরাং অবিলম্বে যদি এর সমাধান না ঘটে তাহলে লক্ষণ পালিতের মতো পুঁজিপতি, চিন্ময়ের মতো কংগ্রেস নেতার, মৃগাঙ্কের মতো পুলিশ, গোবিন্দর মতো সাংবাদিকদের শিরে সংক্রান্তি দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে লক্ষণ মিটিং-এ উপস্থিত তিনজনকে নির্দেশ দিয়েছে— প্রথমত, স্বপন ও

মুস্তাফাকে মেরে ফেলতে হবে; দ্বিতীয়ত, চিন্ময়, যাকে জনগণ চিনু গুন্ডা হিসেবে চেনে তাকে সংবাদপত্রের প্রচারের মাধ্যমে আদর্শ নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তৃতীয়ত, জনগণের কাছে সীমান্ত সংকটের কথা তুলে ধরতে হবে। প্রচার করতে হবে চিনা সৈনিক ভারতের সীমান্তে উপস্থিত। যাতে দেশের জনগণ অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা ভুলে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সমস্যা নিয়ে মেতে থাকে।

নাটকের মধ্যে আর একটি অন্যতম চরিত্র মণিভূষণ মিত্র। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনীতির এই সংকটে সে পরিণত হয়েছে গুন্ডায়। সাতের দশকের সমাজে মণিভূষণ একা নয়, দলে দলে কিছু যুবক বেকারত্বের জ্বালায় ভুল পথে চালিত হয়েছিল। তার কথাতেই এই বক্তব্য পরিষ্কার ফুটে ওঠে—

> ‘আমরা বাড়িতে লাঞ্ছিত হতাম, পথেঘাটে অপমানিত হতাম। এঁর পুলিশের অত্যাচারে পালিয়ে বেড়াতাম। কিন্তু দোষটা আমাদের ছিল না। কাজ নেই, কাজ কেউ দিতে পারেননি। সেটা আমাদের দোষ নয়। তারপর এসে বললেন, সি-পিএমকে মেরে পাড়াছাড়া করতে হবে—তাহলে চাকরি দেবেন। পুলিশ-পাহারায় দিনের পর দিন আক্রমণ চালিয়েছি। এ পাড়ায় সি-পি-এম-এর শান্তনু রায় মরেছে, জীবনকৃষ্ণ, সুরেন, জসীম, গণেশ—নকশাল ছেলে অনুপম সরকার, ভয় কাকে বলে জানে না। কিন্তু চাকরি পাইনি। তখন বললেন, নির্বাচনটা পার করতে হবে, তাহলে গদিতে বসেই সকলকে চাকরি দেবেন। আমার ছেলেরা তাই মেনে নিয়ে গুণ্ডামি আর জোচ্চুরিতে নামল। বিপক্ষের ইলেকশন-এজেন্টকে গুম করেছি, ব্যালট বাক্স পাল্টে দিয়েছি, ভোটকেন্দ্রে যেন সাধারণ মানুষ না আসতে পারে তাই বন্দুক নিয়ে পাহারা দিয়েছি, বোমা মেরে ভোটকেন্দ্র তছনছ করেছি, হাজারে হাজারে জাল ভোটপত্রে ছাপ মেরে বাসে ফেলেছি। কিন্তু চাকরি পাই নি—ক্ষুধার জ্বালায় তবু জ্বলছি! দলের ছেলেরা সব চলে গেছে এদিকে-ওদিকে, বীরেশ্বর আত্মহত্যা করেছে। আর বুদ্ধদেব—যে আপনাদের জন্য রক্তে হাত ডুবিয়েছিল—তাকে মিসায় আটকে রেখেছেন আপনারা।’[২৪]

মণিভূষণরা আসলে শাসক শ্রেণির দাবার চালের এক একটি বোড়ে। যারা সামনের দিকে এগোতে পারে ঠিকই, কিন্তু পিছিয়ে আসতে পারে না। সেজন্যই মণিভূষণ যখন সেই অপরাধের জগৎ থেকে সরে আসতে চেয়েছে তখন তাকে ভয় দেখানো হয়েছে আইনের। কারণ মণিভূষণের অপরাধ দীর্ঘ, সেসব অপরাধের একাধিক ফাইল গচ্ছিত রয়েছে পুলিশের দপ্তরে। ফলে না চাইলেও তাকে লক্ষণ, চিন্ময়দের কথা মতোই কাজ করতে হয়। নাটকে দেখি স্বপন ও মুস্তাফাকে রদ করতে মণিভূষণকে এগিয়ে দেওয়া হয়। লক্ষণ, মৃগাঙ্ক ও চিন্ময় তাকে নির্দেশ দেয়, কাল রাত্রে পাড়ায় ঢুকে 'মাও সেতুঙ জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে এক কনস্টেবলকে হত্যা করার, আর পরশু রাত্রে 'জ্যোতি বসু জিন্দাবাদ' বলে কংগ্রেসের অফিসে বোমা মারার—যাতে জনগণ মনে করে নকশাল এবং সি. পি. আই. (এম.) পুনরায় খুনোখুনি শুরু করেছে। সেই সুযোগে স্বপনকে গিয়ে মণিভূষণ খুন করবে। এর বদলে মণিভূষণকে পুরস্কার স্বরূপ তার নামে গচ্ছিত থাকা সমস্ত পুলিশ ফাইল পুড়িয়ে দেওয়া হবে।

মিটিং-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় দৃশ্যে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। চিন্ময় গোস্বামী জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছে। তাকে পাহারা দিতে পুলিশ, সি. আর. পি. যেমন আছে, তেমনি গিরীন ও মণিভূষণের মতো গুন্ডারাও আছে। জনগণের মধ্যে এক সন্ত্রাসের ছায়া বর্তমান—কৃষ্ণচূড়া জানা, দ্বৈপায়ন, শিবশম্ভু, জনক দাস, অন্ধ কিশোর পল্লব সকলেই মাথার উপরে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বক্তৃতায় চিন্ময় নকশাল ও সি. পি. আই. (এম.)-এর উপর সমাজদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার দোষ আরোপ করছে। একদিকে চিন্ময়ের বক্তৃতা মঞ্চে বিরাট পোস্টার লাগানো 'মজুতদারদের শাস্তি চায়', আর অন্যদিকে লক্ষণ পালিতের সঙ্গে চিন্ময় হাত মিলিয়ে চলে। বাজারে নিত্যদিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত। কিন্তু প্রতিবাদ করার কোনও উপায় নেই, কারণ গিরীনের মতো সরকারের মদতপুষ্ট গুন্ডারা সমস্ত প্রতিবাদই থামিয়ে দেয়। সাতের দশকে এইসব গুন্ডাদের দাপাদাপিতে সাধারণ মানুষ হেনস্তার শিকার হত। পুলিশ-প্রশাসনও তাদের রক্ষাকবচ দিয়ে থাকত। কৃষ্ণচূড়া ও শিবশম্ভু কথোপকথনে তাই শোনা যায়—

'কৃষ্ণচূড়া : আমি তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। ( জামার মধ্যে পিঠের দিক থেকে একটা মোটা বই বার করেন) একটা

টেলিফোন ডাইরেক্টরি পিঠে বেঁধে নিলে অনেক মারধোর থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরুনো যায়। এটা আজকের কলকাতার পোশাক-আশাকের একটা অপরিহার্য অঙ্গ– গেঞ্জি, টেলিফোন ডাইরেক্টরি, পাঞ্জাবি।

শিব : কার্ফু, বাড়ি বাড়ি ঢুকে খানাতল্লাসি, রাস্তায় বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মার—অথচ শুধু বলে গণতন্ত্র। আর খেতে চাইলেই চীনকে গালাগাল শুরু করে।'[২৫]

ঘটনার অগ্রগতিতে দেখা যায়, জনকের চায়ের দোকানে স্বপন ও মুস্তাফা আসে, তাদের হাতে পোস্টার—

'স্বচক্ষে দেখুন! মজুতদার লক্ষণ পালিতকে বাঁচাতে পুলিশ আর সি-আর পি হাজির!'[২৬]

সেসময় দোকানে উপস্থিত কৃষ্ণচূড়া জানা, দ্বৈপায়ন, শিবশম্ভু প্রভৃতি সবাই তাদের দেখে আশঙ্কিত। তাদের মধ্যে শহুরে মধ্যবিত্ত সুলভ ভীতি কাজ করে। জীবন বিপন্ন করে রাজনীতি করতে তারা অনিচ্ছুক। কিন্তু স্বপন ও মুস্তাফা তাতে নিরাশ হয় না; তাদের মনে করিয়ে দেন সমসাময়িক কিছু ঘটনা, যা প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকারকেই আতঙ্কে ফেলেছে—যেমন রেল ধর্মঘট বা গুজরাত ও বিহারের আন্দোলন।

অকস্মাৎ সেখানে স্বপন ও মুস্তাফার সন্ধান পেয়ে মনি, গিরীন সহ পুলিশ এসে উপস্থিত। আগেই বলেছি মনিভূষণ গুন্ডায় পরিণত হয়েছে বেকারত্বের জ্বালায়। সে শিক্ষিত, জানে তার বেকারত্বপূর্ণ জীবনের জন্য কারা দায়ী। সে নিজের শ্রেণিশত্রুকে ভালোভাবেই চেনে; কিন্তু সে নিরুপায়, প্রতিবাদ করার সাহস তার মধ্যে নেই। স্বপন ও মুস্তাফার কাজকর্মের প্রতিও তার প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। সেজন্যই বারবার তাদের হাতে পেয়েও মারেনি, বরং পালাতে সাহায্য করেছে। এখানেও সে তাই করে, কিন্তু পুলিশ তাতে বাধ সাধে। তখনই দেখা যায় এক আশ্চর্য ঘটনা—যে কৃষ্ণচূড়া জানা, দ্বৈপায়ন, শিবশম্ভু প্রথমে স্বপন ও মুস্তাফার কাজে আস্থা রাখতে পারছিল না, তারাই পুলিশ ও গুন্ডাদের হাত থেকে স্বপন ও মুস্তাফাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আসলে মুখে

এরা স্বপন ও মুস্তাফার কাজের সমালোচনা করলেও কোথাও গিয়ে তারা এদের রাজনৈতিক নীতিতে সমাজ বদলের আশার আলো দেখেছিল। ফলে এই নির্যাতনের দিনে তারাও ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই সেখানে চিন্ময়, মৃগাঙ্ক ও গিরীন প্রবেশ করলে তারা কেউ ভয় পায়নি। তাদের ভুয়ো উন্নয়নের উপর প্রশ্ন তুলেছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শ্বাপদের দল সেই প্রতিবাদকে প্রথমেই মাড়িয়ে দিতে চায়। সেজন্যই তারা স্বপনের অন্ধ ভাই পল্লবকে সকলের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করে।

নাটকের অন্তিম দৃশ্যে এসে দেখা যায়, লক্ষণ পালিত জানতে পেরে যায় মনির দ্বিচারিতার কথা। মনি তাদের সঙ্গে থাকলেও, তাদের পয়সায় পালিত হলেও আসলে তাদের প্রতি তার মনে রয়েছে তীব্র ঘৃণা। কিন্তু মনিকে তাদের প্রয়োজন। সেজন্য মনিকে জব্দ করতে তার পূর্বের প্রেমিকা, যার জন্য এখনও মনির মনে দুর্বলতা রয়েছে তাঁকে মিসায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মনির কাছে শর্ত দিয়েছে যদি মনি স্বপনকে হত্যা করে তাহলে পূর্ণিমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এখানেই মনি প্রতিবাদের স্বরে তাদের বলে ওঠে—

> ‘শালা আজ বিকেলের মধ্যে যদি পূর্ণিমা বাড়ি না ফেরে তবে কেলেঙ্কারি ফাঁস হবে। এবং সে কেলেঙ্কারি আরো বহুদূর গড়াবে, বাবুরা! এটা ফাঁস হলেই লোকে হেমন্ত বসুর খুনের ব্যাপারটা বুঝবে, জজ আর উপাচার্য খুন হবার রহস্যটা ধ’রে ফেলবে। আরো ডজন ডজন হত্যাকাণ্ডের নায়করা ধরা পড়ে যাবেন! কলকাতাকে যে আপনারাই দুঃস্বপ্নের নগরী ক’রে তুলে নকশাল আর সি-পি-এমকে নন্দ ঘোষ বানিয়ে শেষ করে দিতে চাইছিলেন, এসব লোকেরা বুঝে ফেলবে। প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন, স্যারেরা! হাঃ হা! অরণ্যদেবের পাল্লায় পড়েছেন বাবুরা!’[২৭]

এভাবেই নাটকটিতে সমস্ত নির্বিবাদী ও শাসকের পক্ষে থাকা ব্যক্তিরা ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। ফলে লক্ষণরা আর মনির উপর ভরসা রাখতে পারেনি, গিরীনকে স্বপন হত্যার দায়ীত্ব দিয়েছে।

নাটকের শেষে দেখা যায় মনিভূষণ লক্ষণ পালিত সহ বাকিদের কুকীর্তির কথা জনসমাজে প্রকাশ করে দিতে উদ্যোগী হয়। সুতরাং তাকে জীবিত রাখা তাদের পক্ষে

ক্ষতিকর। সেজন্যই মৃগাঙ্ক এসে তাকে গুলি করে হত্যা করে। আবার অন্যদিকে আনন্দ কেবিনে কৃষ্ণচূড়া জানা, দ্বৈপায়ন, শিবশম্ভু প্রমুখ রোজকারের মতো আড্ডা দিচ্ছিল, সেখানে স্বপনও আসে; কিন্তু সেদিন শ্রমিক-মিছিল বেরানোর কথা, সেজনই স্বপন সে কাজেও ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আনন্দ কেবিনে স্বপন উপস্থিত থাকার সময়েই গিরীন নিজের দলবল নিয়ে পৌঁছে যায়। কিন্তু এবারও কৃষ্ণচূড়া জানা, দ্বৈপায়ন, শিবশম্ভু প্রমুখ সকলে মিলে তাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটায়, স্বপনকে পালাতে সাহায্য করে। পড়ে গিরীন সেকথা জানতে পেরে মারমুখী হয়ে উঠে। এমন সময় স্বপন ও মুস্তাফা সঙ্গে শ্রমিক-মিছিল নিয়ে সেখানে ঢোকে। এখানেই নাটকটির রাজনৈতিক সার্থকতা। উৎপল দত্ত প্রতিবাদী মানুষের স্বরকে দমে যেতে দেননি, তাদের একজনের লড়াইকেই শেষ পর্যন্ত গণ-লড়াইয়ে উত্তীর্ণ করেছেন। এই নাটকেও তাই প্রকাশিত।

**হে সময়, উত্তাল সময় :**

প্রখ্যাত নাটককার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সাতের দশকের সন্ত্রস্ত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রচনা করেন ‘হে সময়, উত্তাল সময়’ নাটকটি। একজন নাট্যকারের দৃষ্টিতে সময়ের অস্থিরতা এখানে বিশ্লেষিত হয়েছে। নাটকের কাহিনিতে দেখা যায় একটি নাট্যদল মহাভারতের ‘মুষল পর্ব’ অবলম্বনে একটি নাটক পরিবেশন করতে চলেছে, কিন্তু সমসাময়িক রাজনৈতিক জটিলতায় তাতে বিলম্ব ঘটছে। অর্থাৎ নাটকের মধ্যে নাটক পরিবেশন হচ্ছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকটির নাম ‘হে সময়, উত্তাল সময়’—যেটি সাতের দশকের পটভূমিতে রচিত; আবার নাটকের কাহিনিতে অভিনীত নাটকটির নামও ‘হে সময়, উত্তাল সময়’—সেটি মহাভারতে মুষল পর্বের পটভূমিতে রচিত। সাতের দশকের সন্ত্রস্ত পরিবেশে নাট্যব্যক্তিত্বদের যেসব সমস্যায় পড়তে হত তার একটি বাস্তব চিত্র এই নাটকটি তুলে ধরেছে।

নাটকের কাহিনি শুরু হতেই দেখা যায় সাতের দশকের সন্ত্রস্ত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে একটি নাট্যদল নাটক পরিবেশন করতে চলেছে, সেজন্য প্রস্তুতিও চলছে জোর কদমে। কিন্তু সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে ওঠার আগেই নাটকের বেল পড়ে যায়, আবার এদিকে নাটক শুরুর সময়ও হয়ে এসেছে। তখন প্রযোজক এসে দর্শকদের জানায়

তাদের রূপসজ্জাকর এখনও এসে উপস্থিত না হওয়ায় তারা নাটক শুরু করতে পারছে না। রূপসজ্জাকরের এরকম বিলম্ব হওয়ার কারণ তাদের পাড়া সি. আর. পি. ঘেরাও করেছে। ফলে পাড়া থেকে বেরানো তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময়েই হঠাৎ টেপ রেকর্ডারে বেজে ওঠে—

> 'আজ্ঞে না। এই শুরুটা কিছু নয়। এটা আসলে একটা বিরক্তিকর ড্রামাটিক স্টান্ট মাত্র। আসলে এই কনটেম্পোরারিটি, এই সাময়িকতা আমাদের দিনরাত হন্ট করছিল। কিন্তু সোজা কথা সোজা করে বলার দিন তো সাময়িকভাবে থেমে গেছে এ কথা আমরা সবাই জানি—মানে ইন্দিরা গান্ধি থেকে ক্লাস থ্রি-র ছেলেটি পর্যন্ত।'[২৮]

কিন্তু এই 'বিরক্তিকর ড্রামাটিক স্টান্ট'-টি আর স্টান্ট হয়েই থাকেনি, সেটি বাস্তবে পরিণত হয়েছে। সত্যি সত্যিই নাট্যদলের ছ'জন অভিনেতা আসতে পারেনি। কিন্তু তারপরেও যাই হোক করে পরিচালক তাদের নাটক শুরু করে দিয়েছে।

নাটক শুরু করার আগে প্রযোজক নাটকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছে—

> 'আমরা যেমন মুশকিলে পড়লে ঠাকুরদেবতা, বাবা-মা-র কথা স্মরণ করি, তেমনি আজকে দেশের এই গভীর-গভীরতর অসুখের দিনে আমরা মহাভারতের কাছে যেতে চাই। জানতে চাই এখনও তার দরকার আছে কি না। আজকের যুগেও মহাভারতের কোনো রেলেভেন্স মানে প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা, ভ্যালিডিটি আছে কিনা।'[২৯]

সেই কাহিনিতে দেখি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ৩৫ বছর পার হয়ে গেছে। যুদ্ধ বেঁধেছিল পাণ্ডব ও কৌরবের মধ্যে, কিন্তু সেই যুদ্ধে মিত্রদেশ হিসেবে দ্বারকাও লিপ্ত হয়। সেজন্য যুদ্ধোত্তর দ্বারকা নগরে ধ্বংসের দিন আগত। মুনি-ঋষিরা দীর্ঘদিন তপস্যা করেও জীবনের সম্পূর্ণতা জেনে উঠতে পারেনি। দ্বারকা নগরীর যুবকের দল, যারা দেশের ভবিষ্যৎ তারা বিপথগামী, ধর্মগ্রন্থ বা নীতিশিক্ষায় তাদের আকর্ষণ নেই, বদলে তারা মদ ও মেয়ে নিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনে মত্ত। প্রাচীনদের তারা হেয় করে, মুনিদের অপমান করে। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণেরও বয়স হয়েছে, মৃত্যুর দিন আসন্ন প্রায়। তার স্বপ্নেরও মৃত্যু ঘটেছে দ্বারকাপুরীতে। মুনির অভিশাপে কৃষ্ণের ছেলে শাম্ব গদা জন্ম দেয়—যা যদুবংশের ধ্বংসের কারণ হবে। এই

ভবিষ্যতকে রদ করতে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে দেশের সকলের উদ্দেশে ঘোষণা করা হয়, যেন তারা নিজেদের সমস্ত অস্ত্র সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। কারণ অন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য অস্ত্র নিজেদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ নবীনদের উদ্দেশ্যে বাণী দিলেন অতীতকে দোষারোপ না করে বর্তমানকে শোধরানোয় মনোযোগ দিতে। কারণ বর্তমানের সঠিক কাজই পারে সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে দিতে। কিন্তু সে পথে নবীনরা পা বাড়ালো না। তারা সমস্ত রকম পাপ কাজে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। যে যদুবংশ এতদিন ছিল একত্র, তার মধ্যে বিভাজন হতে শুরু করে। যদুবংশীয়রা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়, পড়ে সেই সব দলও ভেঙে আবার নতুন দল সৃষ্টি করে। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পতাকার নিচে এসে দাঁড়ায়, প্রত্যেকে প্রত্যেককে শুত্রু ভাবতে শুরু করে। দ্বারকাপুরীর বর্তমান দুর্দশার জন্য একে-অপরকে প্রকাশ্যে দোষারোপ করে।

শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা সত্ত্বেও সব অস্ত্র নষ্ট করা যায়নি। সকলেই কিছু কিছু অস্ত্র গোপনে রেখে দিয়েছিলেন। সেই সব অস্ত্র এতদিনে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রথমে অন্ধকারে পথে প্রান্তরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করতে শুরু করে। ক্রমে তা সকলের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। দিনের আলোতেও আর হত্যা করতে দ্বিধা-ভয় কিছুই করে না। প্রাণহরণ যেন বীরত্ব বলে গণ্য হত তাদের কাছে। পণ্ডিত ও জ্ঞানীরা দিশেহারা হয়ে প্রাণের ভয়ে ঘরে বন্ধ হয়ে থাকে। সৎ-অসৎ এবং ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত। বিভিন্ন দল আপন পতাকাতলে সৈনিক, ব্যাধ ও কর্মহীন যুবকদের সংগঠিত করে তাদের ব্যবহার করতে শুরু করে এক হত্যা অনুষ্ঠানের সূচনা করে। এই উদ্দেশ্যহীন দ্বারকার নাগরিক জীবন উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যদুবংশের এই উন্মত্ততা নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। প্রভাসতীর্থে এসেও তারা সঙ্গে নিয়ে আসে মদ আর মাংস, বিলাসিতার জন্য হাতি ঘোড়া আর রথ। প্রভাসতীর্থেও তারা স্ত্রী সঙ্গ নিয়ে থাকে। নট নর্তক আর মাতালে ভরে গেল প্রভাসতীর্থ।

নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলা দ্বারকাপুরীকে এরকম উচ্ছৃঙ্খল, প্রতিহিংসাপরায়ণ, বিভাজিত অবস্থায় দেখে শ্রীকৃষ্ণ আহত, আশাহত। স্বপ্নভঙ্গের কষ্টে শেষপর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা ছেড়ে চলে যায়, বলরাম আগেই গেছে। কিন্তু নাটক এখানেই শেষ নয়, পিতা বাসুদেবের কাছে শ্রীকৃষ্ণ বলে গেছেন অর্জুন আসবে সকলকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে নতুন দেশে। নতুনভাবে তারা বাঁচতে শিখবে, নতুন করে খুঁজে পাবে জীবনের মানে।

নাটকের সম্পূর্ণ অংশে যে কাহিনি ফুটে উঠল তা যেন কোনও পৌরাণিক কাহিনি নয়, এ যেন সাতের দশকের বাস্তবতা। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা, সামাজিক কাঠামোর অবক্ষয় যেন একটি পৌরাণিক পটভূমিতে তুলে ধরা হয়েছে। সাতের দশকের হানাহানির যুগে দাঁড়িয়ে যেন সকলেই একটি অর্জুনের প্রতীক্ষা করেছিল।

**মিছিল :**

১৯৭৪ সালের ১৪ এপ্রিল 'শতাব্দী' নাট্যসংস্থা বাদল সরকারের 'মিছিল' নাটকটি তাঁরই নির্দেশনায় উত্তর চব্বিশ পরগণার রামচন্দ্রপুর গ্রামে প্রথম অভিনয় করে। তার দু-দিন পর ১৬ এপ্রিল অভিনীত হয় কলকাতার 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস'-এর অঙ্গনমঞ্চে। এই নাটকটি সম্পর্কে নাটককার নিজেই বলেছেন—

> 'কলকাতার সাথে আমার সবসময়েই একটা ভালোবাসা-ঘৃণার সম্পর্ক। সত্তর দশকের প্রথমে কোলাজের আঙ্গিকে কলকাতার ওপর একটা নাটক তৈরির ভাবনা আমার মাথায় এসেছিল। যেহেতু কলকাতা 'মিছিল নগরী', তাই যথাযথ নাম হিসেবে ওই নাটকটি তৈরি করার উপযুক্ত পথ হিসেবে 'মিছিল' নামটাই আমার উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল। ঠিক তার আগের কয়েক বছরে বহু মানুষ, কিশোর-কিশোরী পুলিশের হাতে গোপনে ও প্রকাশ্যে পশুর মতো নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল। প্রত্যেকদিন খুন হয়ে যাওয়া একটা লোকের ছবি তাই আমার মাথায় গেঁথে গিয়েছিল। আর সম্ভবত চরিত্রটিতে নিজেকে ভেবেই একটি বৃদ্ধ বিদুষকের অস্পষ্ট ধারণা আমার মনের মধ্যে তৈরি হল। কিছু কিছু টুকরো-টাকরা মন্তব্য, এমনকি বিচ্ছিন্ন কিছু দৃশ্যও তৈরি হল বটে, কিন্তু কোনও পরিষ্কার চেহারা বা অভিমুখ তাতে ছিল না।'[৩০]

রাজনীতির এরকম প্রেক্ষাপটে 'মিছিল' নাটকটি রচিত হয়। 'খুন' হওয়ার যে কথা বলেছেন নাটককার তা আসলে নকশাল কর্মীদের খুন। যা নকশাল আন্দোলন দমন করতে তৎকালীন সরকার ও পুলিশ-প্রশাসন মিলিত হয়ে বিশেষ সক্রিয়তার সঙ্গে

করেছিল। সেই বিষয় নিয়েই এই নাটকটি রচিত। তবে এখানে কেবল নকশালদের কথাই একমাত্র প্রাধান্য পায়নি, এখানে উঠে এসেছে সেই সময়ের জটিল রাজনীতির একটা আবর্তন যা কিনা সাতের দশকের প্রথমার্ধ জুড়ে আবর্তিত হয়েছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষে। একদিকে নকশাল আন্দোলনকে দমানোর জন্য চলছে পুলিশি অভিযান ও তৎপরতা, ঘটছে একের পর এক হত্যাকাণ্ড। আর অন্যদিকে চলছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে মিছিল—যার মাধ্যমে কোনও সমস্যার সুদূর প্রসারী সমাধান হয় বলে নাটককার মনে করেননি। নাটকটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

নাটকটিতে আছে 'এক' থেকে 'ছয়' পর্যন্ত কোরাস চরিত্র। পৃথক পৃথক স্থানে পৃথক পৃথক ভূমিকায় এরা অভিনয় করে। এছাড়া নির্দিষ্ট ভূমিকায় খোকা, কোটাল, বুড়ো এবং কর্তা। নাটকটিতে কোনও বিশেষ কাহিনি গড়ে ওঠেনি, কতগুলি বিশেষ নাটকীয় চিত্র এবং বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে—যেগুলিতে তৎকালীন রাজনীতির পরিসর উঠে এসেছে। ধরা পড়েছে নাটককারের রাজনীতির সচেতনতা। সেই চিত্র ও বক্তব্য বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে।

নাটকটি শুরু হয়েছে একটি 'খুন'-এর দৃশ্য দিয়ে। শহরের কোনও একটি জায়গায় খোকা খুন হয়েছে। তার গগনভেদী আর্তনাদ শুনে কোরাস চরিত্র তাকে খুঁজছে, এখানে কোরাস চরিত্র হয়েছে সাধারণ পথচলতি নাগরিক। কিন্তু কোটাল এসে কোরাসদের তা করতে বাধা দেয়। কোটাল হচ্ছে সরকারের প্রশাসন, যে সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে অস্বীকার করে এবং জনগণকেও তা করতে বাধ্য করে। তাই সমগ্র নাটকজুড়েই সে খোকার খুন হওয়ার খবরকে চেপে দিতে চায়। এরপর নাটকে প্রবেশ করে 'বুড়ো'। নাটকে যে একটি বিভ্রান্ত চরিত্র। আবহমানকাল থেকে প্রতিনিয়ত সমাজে চলছে মিছিল, বিভিন্ন জাতের মিছিল—অন্ন-বস্ত্র মিছিল, পরমার্থ মিছিল, বিপ্লবী মিছিল, উদ্বাস্তু মিছিল, বন্যাত্রাণ মিছিল, শোক মিছিল, প্রতিবাদ মিছিল, উৎসব মিছিল। প্রত্যেক মিছিলের উদ্দেশ্য উন্নত সমাজ গড়ার। কিন্তু তা কি সম্ভব হয়েছে? এই মিছিলে প্রায় দলিত হয়ে যায় কত শত খোকা, হারিয়ে যায় তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু পথ পায়না কিছুতেই। পথের শেষ কোথায়? কেউ জানেনা। বুড়োও না, খোকাও না। তাই খোকা বলে—

> ‘আমি খুন হই রোজ। রোজ রোজ খুন রোজ মৃত্যু রোজ! আমি খুন হব কাল। পরশু, তরশু, আসছে সপ্তায়। আসছে মাসে। আসছে বছর!’[৩১]

আর বুড়ো বলে—

> ‘কিন্তু রাস্তা কোথায়? ঘুরে ফিরে সেই একই রাস্তা। মোড় ঘুরে মোড় ঘুরে একই রাস্তা। মিছিল কোথায়? যে মিছিল পথ দেখাবে? সত্যিকারের সত্যি মিছিল?’[৩২]

এখানে বিভিন্ন খবরের কাগজের প্রসঙ্গ এসেছে—যেগুলিকে দেখানো হয়েছে গাধার টুপি করে। যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, আসল উদ্দেশ্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। এখানে কোরাস চরিত্রের মাধ্যমে শহরের জীবনযাত্রার কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে—যেমন ট্রেন, বাসে কর্মব্যস্তময় সাধারণ মানুষের জীবনের চিত্র, বাজারের চিত্র ইত্যাদি। এগুলি সবই এক-একটা মিছিল। জীবন-সংগ্রামে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সমাজে প্রতিনিয়ত চলছে মিছিল। কিন্তু কোনও মিছিলই বুড়োকে ‘সত্যিকারের সত্যি বাড়ি’-র সন্ধান দিতে পারছে না। আর বুড়ো তার ‘পুরোনো বাড়ি’-তে ফিরে যেতে চায়ছে না। কারণ ‘সেই পুরোনো বাড়িটা তো বর্তমান সমাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃদ্ধ লোকটি যে নতুন বাড়ি খোঁজে—সেটা তো এমন একটা জায়গা যেখানে কোনও অনাহার নেই, কোনও কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়া নেই, কোনও অন্যায় অবিচার নেই।’[৩৩]

বাদল সরকারের নাটকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর ইতিহাসচেতনা। সাতের দশকের রাজনীতি মুখর কলকাতায় যে মিছিলের মিছিল তৈরি হয়েছিল তা নতুন কোনও ঘটনা নয়। তার বহু পূর্ব থেকেই সুস্থ সমাজ গড়ার তাগিদে একের পর এক মিছিল সংগঠিত হয়েছে। সে প্রসঙ্গেই উঠে এসেছে পরাধীন ভারতবর্ষের কথা। বলা হয়েছে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বরাজ, অহিংসা, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, চরকার গুরুত্ব, ভারতছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দেশভাগ করে স্বাধীনতা অর্জনের কথা। তারপর দেখতে হল উদ্বাস্তুদের মিছিল।

স্বাধীনতা লাভেই সমস্যার সমাধান হল না। এল নতুন সমস্যা। কমিউনিস্টরা স্লোগান তুলল ‘এ আজাদি ঝুটা হ্যা!/ ভুলো মাৎ ভুলো মকৎ!’[৩৪] এভাবেই নাটকের গতি

এসে উপস্থিত হয় ইন্দিরা গান্ধির জমানায় তথা বিশ শতকের সাতের দশকের ভারতে। নাটকে যে কর্তা চরিত্র আছে সে বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধি। কখনও সে ধর্মগুরু সেজে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে আবার কখনও সে শাসক ও শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন। এই কর্তার মধ্যেই ধরা পড়ে ইন্দিরা গান্ধি। যার কথাতে উঠে আসে-

> 'মনে রাখবেন ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব। মনে রাখবেন সংবিধানের মৌলিক অধিকার। মনে রাখবেন—সবুজ বিপ্লব, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ, পরিবার পরিকল্পনা, ডলার সাহায্য, আণবিক বিস্ফোরণ, মিসায় গ্রেফ্‌তার।'[৩৫]

এত পরিকল্পনা সত্ত্বেও কালোবাজারি চলতে থাকে রমরমিয়ে। সাধারণ মানুষের পক্ষে রোজকার জীবনযাপন করা দুষ্কর হয়ে উঠছে। এখানে একটি দৃশ্যে 'ছয়' একজন নিপীড়িত গরিব মহিলার ভূমিকার অভিনয়ে একটি বাসি রুটি চেয়েও পায়নি। অপরদিকে সমাজের পুঁজিপতি শ্রেণি উদ্বৃত্ত উৎপাদন শোষণ করে প্রতিনিয়ত তাদের সম্পদ বাড়াচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। যুবক-কৃষক-শ্রমিকদের যে অবস্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে সেটি সাতের দশকের একটি জ্বলন্ত বাস্তব।–

> 'এক : তিন বছরেও চাকরি হল না, বাবা রিটায়ার করে গেলো।
>
> দুই : কারখানায় আজ ছত্রিশ দিন ল্‌ক-আউট্‌, ঘরে হাঁড়ি চড়ে না।
>
> তিন : অকালে বৃষ্টি হয়ে ধান পচে গেল, মহাজনের কাছে দেনার পাহাড়।
>
> চার : ভেজাল তেল খেয়ে বাড়ি শুদ্ধ শয্যাশায়ী, ডাক্তার ডাকবার পয়সা নেই।
>
> পাঁচ : ভাইটাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেলো, পিটিয়ে মেরে ফেললো।'[৩৬]

কিন্তু সরকার এসব সমস্যা সমাধান করার কথা ভাবে না। নানাভাবে মানুষকে ভুলাবার চেষ্টা করে। সেই থেকেই শুরু হয় বিক্ষোভ। যুবকরা ঝাপিয়ে পড়ে নকশাল আন্দোলনে। তা দমন করতে প্রশাসন সক্রিয় হয়, সঙ্গ দেয় সরকারের দুষ্কৃতি ও গুন্ডারা। মারা যায় খোকার মতো যুবকরা। কিন্তু তার কোনও বিচার হয়না। কারণ কোটাল অর্থাৎ সরকারের

প্রশাসন সেই খুনের ঘটনা চেপে দেয়। নাটকের এরকম পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছে আর একটি চিত্র, যেখানে শাসক পক্ষের একদল মানুষের ভূমিকায় এসেছে কোরাস চরিত্র, যারা বিভিন্ন অনিয়মে মুনাফা লুটে, তাদের সেই কাজে বাধার সৃষ্টি করেছে বিভিন্ন আন্দোলন ও বিক্ষোভ। তখন তাদের সংলাপে উচ্চারিত হয়, 'এ দেশে দরকার মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ। সব তেড়িবেড়ি পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া দরকার', 'খালি স্ট্রাইক আর ঘেরাও! এই জন্যেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে', 'দুনিয়ার সব শালা লুটেপুটে খাচ্ছে, আমি কেন খাব না?', 'আমরা কি চিরদিনই দুর্বল জাতি হয়ে থাকব? সবে অ্যাটম বোমা তৈরি শুরু হোলো!',।[৩৭] আর অন্যদিকে এই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে শাসকশ্রেণি 'ইয়াংকি কালচার'-এর প্রচার করে।

আগেই বলেছি এই নাটকে বৃদ্ধ চরিত্রটি আসলে নাটককারেরই প্রতিরূপ। সে অপেক্ষা করে এমন এক মিছিলের যে তাকে পথ দেখাবে 'সত্যি বাড়ির'। কিন্তু কোন মিছিলই সেই মিছিল নয়। এমনকি কমিউনিস্টদের মিছিলও নয়। সামান্য দাবি-দাওয়া ছাড়া সেসব মিছিল আর কিছুই আদায় করতে পারে না। ফলে নাটককার সেসব মিছিলে বিশ্বাস রাখতে পারেনি। সেজন্যই বীতশ্রদ্ধ হয়ে মিছিলের প্যারোডি রচনা করেছেন নাটককার—

'কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি-জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!

খেঁকশিয়ালি পালায় ছুটি- জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!' ইত্যাদি[৩৮]

তবে নাটককার আশাহীন নন। তিনি বিশ্বাস রাখেন অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয় সেই মিছিল আসবে। 'সত্যি মিছিল', মানুষের মিছিল। যা 'সত্যিকারের বাড়ির' পথ দেখাবে।

**বাসি খবর :**

ইতিহাসের প্রতি বাদল সরকারের আকর্ষণ ছিল তীব্র। তাঁর প্রায় সমস্ত নাটক ও অন্যান্য লেখালেখির মধ্যে ইতিহাসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আমাদের প্রচলিত ইতিহাস চর্চাকে আঘাত করে প্রবল ভাবে। তিনি নাটকের মধ্যে যেসব ইতিহাসকে স্থান দিয়েছে সেগুলি মূলত সবই শোষণের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের উপর ভর করে তিনি অনায়াসেই

সমকালকে মিলিয়ে দেন। 'বাসি খবর' (১৯৭৮) সেরকমই একটি নাটক। এখানে বাদল সরকার সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে তার সঙ্গে মিলিয়েছেন তাঁর সমকাল বিশ শতকের সাতের দশকে।

'থার্ড থিয়েটার' পর্যায়ের এই নাটকেও কাহিনির কোনও ধারাবাহিকতা নেই, টুকরো টুকরো কিছু ঘটনা এখানে এসে মিশেছে, তবে বিস্তৃতভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সাতের দশক এখানে বর্ণিত। চরিত্রের নাম নেই, 'এক' থেকে 'আট' পর্যন্ত মোট আটজন চরিত্র এখানে অভিনয় করেছে। চরিত্রগুলির সংলাপে বেকারত্ব, প্রেম, সমাজতন্ত্র, মধ্যবিত্ত জীবন, 'গরিবি হটাও' ইত্যাদি কথা উচ্চারিত হয়েছে। যা সাতের দশকে বহুজন বিদিত ছিল। নাটকটিতে চরিত্রগুলি সাধারণত দীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যদিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সাতের দশকের সন্ত্রাস দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছে।

এখানে দেখিয়েছেন সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যেসব সাঁওতাল সম্প্রদায় অরণ্যের মধ্যে নিজেদের সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, বিনিময় প্রথা ছিল যার ভিত্তি, সেই সমাজব্যবস্থা কীভাবে ব্রিটিশ শাসনের সময় তাদের প্রচলিত নয়া অর্থনীতির কোপে পড়ে ক্রমশ ধ্বংস হয়ে গেল। ব্রিটিশদের শাসনে লালিত নয়া জমিদারি ব্যবস্থায় তারা শোষিত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত হয়েছে। জমিদার মহাজনরা তাদের ঋণের জালে আবদ্ধ করেছে, তাদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। সেই শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে ১৮৫৫ সালে সাঁওতালরা সংগঠিত হয়ে 'হুল'-এর ডাক দেয়। বিদ্রোহের দাবাগ্নি ছড়িয়ে পড়ল বিহার, সাঁওতাল পরগনা ও বঙ্গের বেশকিছু অংশে। যা সেই সময়ের শাসক ব্রিটিশ সরকার, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এবং উপরতলার মানুষের কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ব্রিটিশ অর্থনীতিতে তারা লাভবান হয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসে তথাকথিত 'রেনেসাঁস'-এর অপর প্রান্তে যে একটা অন্ধকারের ছবি লুকিয়ে আছে তার চিত্র এখানে তুলে ধরা হল। নাটককার রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য ও তোষণের নীতি এবং ধর্মীয় জাগরণ ও জাতীয়তাবাদকে আক্রমণ শানিয়েছেন। শেষপর্যন্ত ব্যাপক সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী স্তব্ধ করে, যাতে এই বিদ্রোহের আগুন সর্বত্র না ছড়াতে পারে।

পরাধীন ভারতবর্ষের সঙ্গে সাতের দশকের কোনও পার্থক্য নাটককার দেখেন না। স্বাধীন ভারত দুদশক অতিক্রম করা সত্ত্বেও সমস্ত রাজ্যেই ছড়িয়ে আছে বন্ডেড শ্রমিক, ভূমিদাস, দেশের বেশিরভাগ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে, প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দিদের উপর আমানুষিক অত্যাচার করা হয় যখন-তখন। অথচ বর্তমান সরকার সমাধানের বদলে প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করেই যাচ্ছে। নাটকের বিষয় ব্যবহারের সঙ্গে আঙ্গিকের কৌশলেও এই দুই ঘটনার সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন নাটককার। একজন বলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনা তো আরেক জন সাতের দশকের বর্ণনা দেয়। এখানে কতগুলি সংলাপ তুলে ধরলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে—

'আট : পঞ্চাশটা হাতিও পাঠালো সাঁওতাল আর তাদের স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের পায়ের তলায় পিষে মারতে, তাদের কুঁড়েঘর ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিতে। এইভাবে সম্মিলিত—

এক : ১৯৭১ আগস্টে বরানগরে পুলিশের আনুকূল্যে দু'দিনে দেড়শ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়। মৃতদেহগুলি প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার উপর পড়ে ছিল। পরে সেগুলি রিক্সা আর ঠেলাগাড়ি করে নিয়ে গিয়ে হুগলি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। ৬০ বছরের এক বৃদ্ধকে পেট্রোলে চুবিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, কারণ তিনি তাঁর ভাইপোর খবর দিতে পারেন নি। এক স্কুলের ছাত্রীর একটি হাত কেটে—

দুই : সামরিক আইন। মানবতাবোধের লেশমাত্র বর্জিত বর্বর শাসনের প্রতিষ্ঠা। অবাধ লুণ্ঠন, নরহত্যা আর ধ্বংস, যথেচ্ছাচার, নারীনির্যাতন আর বিভীষিকার তাণ্ডব। সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের উপর দিয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার, ধ্বংস আর হত্যার—

তিন : ১৯৭১ জানুয়ারিতে ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গার ধারে পাওয়া যায় ছ'টি মৃতদেহ। তাদের সকলেরই দেহে গুলির আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। ১৯৭১ জুনে কোন্নগরে মাটি খুঁড়ে ন'টি

মৃতদেহ বার করা হয়। প্রায় সব কটির মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং শরীরে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন ছিল।

চার : তারা যতোক্ষণ খাড়া থাকতো, আমাদেরও তাদের উপর গুলি চালাতেই হোতো। যতো সাঁওতাল বন্দী হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই ছিল গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। সাঁওতালরা-

পাঁচ : ১৯৭০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ এপ্রিলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের জেলগুলিতে কারারক্ষী ও পুলিশের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের তথাকথিত সংঘর্ষে সরকারী হিসাবমতেই ৮০ জন বন্দী নিহত ও ৬৪৫ জন বন্দী আহত হয়েছেন। ৮০ জনের মৃত্যু ঘটেছে লাঠির আঘাতে।'[৩৯]

এখানেই নাটকটি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বাদল সরকারের রাজনৈতিক দর্শনে ও থার্ড থিয়েটারের নাটক হিসেবে। যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল রাষ্ট্রের শোষণকে তুলে ধরা, শোষণমুক্ত সমাজ গড়া এবং রাজনৈতিক দিক থেকে অতি সাধারণ জনগণকে সচেতন করা।

**লাসবিপণি :**

সাতের দশকের রাজনৈতিক সংকটের পটভূমিকায় রচিত বহুল পরিচিত নাটক অমল রায়ের 'লাসবিপণি'। এই নাটক সম্পর্কে কবি কমলেশ সেন বলেছিলেন 'লাসবিপণি তো একসময় মিথ হয়ে গিয়েছিল।'[৪০] আশিষ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ও ইউনিট থিয়েটারের প্রযোজনায় সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। সেই সময় নাটকটি মঞ্চস্থ করতে গিয়ে নাট্যকর্মীরা পুলিশি বাধা ও কংগ্রেসি গুন্ডা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল।[৪১] এসব তথ্য থেকেই বোঝা যায় তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে নাটকটির প্রভাব কতটা ছিল। শাসক শিবিরে নাটকটি ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই বারবার তারা নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেয়।

রাজনৈতিক হিংসা, পুলিশি অভিযান, খুন—এগুলি সাতের দশকের সামাজিক জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেজন্য নাটককার এই নাটকে সমগ্র দেশকে একটা মৃতদেহের উৎপাদক হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, যেন মৃতদেহ উৎপাদন করা ভারতবর্ষের অন্যতম শিল্প—যার চাহিদা বিশ্বময়। সেই মৃতদেহ তৈরি করে বিশ্ব বাজারের রপ্তানি করার একটি বিশেষ সংস্থার নাম হচ্ছে 'লাসবিপণি'। ইন্দিরা গান্ধির জামানায় এই সংস্থার জাতীয়করণ হয়েছে। নাটকটির শুরুতেই দেখা যাচ্ছে একটি মৃতদেহ প্রদর্শনী হতে চলেছে এবং তা দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি উপস্থিত, এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা 'লাসবিপণি' সংস্থা—যার হেড অফিস লালবাজার (অর্থাৎ লালবাজার থানা) এবং গুদাম বড়বাজার। প্রদর্শনী সম্পর্কে বলা হয়েছে—'হিন্দু মাসির (ইন্দিরা গান্ধির) আয়োজনে আন্তর্জাতিক মৃতদেহ প্রদর্শনী।'[৪২]

শ্রীপাতিরাম পতিতুণ্ড জাতীয়করণ হওয়ার আগে 'লাসবিপণি'-র মালিক ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তিনি মৃতদেহ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী ভাষণ দেন এবং তারপর আগত বরেণ্য দর্শক কুলের সামনে লাশ প্রদর্শন করান। এখানে প্রদর্শিত লাশের সংখ্যা তিনটি—কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র। এই তিনটি লাশের মুখ দিয়ে তাদের জীবনকাহিনি বলিয়ে নাটককার সেই সময়ের সমাজে বিশেষভাবে সংকটে জর্জরিত, শোষিত, অবহেলিত তিন গোষ্ঠীর জীবন যন্ত্রণার কথা বলেছেন; যাদের দ্বারা সমাজ বা রাষ্ট্র টিকে থাকে তারাই সেই সমাজ বা রাষ্ট্র দ্বারা কীভাবে অত্যাচারিত, নিপীড়িত হয় সেই বাস্তব চিত্র নাটকে বিধৃত হয়েছে।

পাতিরাম পতিতুণ্ডর উদ্বোধনী ভাষণে এবং সেই ফাঁকে গাইডের সঙ্গে কথোপকথনে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং বৈদেশিক সম্পর্কের দুর্বল দিক গুলি উঠে এসেছে। এখানে গাইড হচ্ছে সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, যাকে নাটকে 'মেরুদণ্ডহীন' বলে তার সুবিধালোভী মানসিক অবস্থানকে নাটককার আঘাত করেছেন। ভুল ইংরেজি ও বাংলা বলা পাতিরাম পতিতুণ্ড খুব সহজে বলতে পারে 'আমি গণতন্ত্র নামক বস্তুটার ছিঁড়েছি মুন্ডু'[৪৩] এবং নির্বাচনী লড়াই করা যার অন্যতম ইচ্ছা। এদের মতো একজন সমাজবিরোধী অশিক্ষিত ব্যক্তি দেশের ক্ষমতার গদিতে বসতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে।

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, রাজনৈতিকভাবে যে সময় ইন্দিরা গান্ধি সিণ্ডিকেটের দ্বারা কোনঠাসা, সে সময় তিনি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে এবং জননেতা হয়ে উঠতে মধ্য-বামপন্থা অবলম্বন করে নিজেকে রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসেন, নিজেকে সমাজতন্ত্রী নেতা হিসেবে তুলে ধরতে ব্যাংক জাতীয়করণের মতো বেশ কিছু পদক্ষেপ নেন, ১৯৭১-এর নির্বাচনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ, সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সর্বোপরি 'গরিবি হটাও' স্লোগানের দ্বারা পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এসব বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই সমাজতন্ত্র কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল তা সংশয়ের অবকাশ রাখে। আবার পররাষ্ট্রনীতিতে আমরা বারবার দেখেছি কখনও আমেরিকার সঙ্গে সুহৃদের সম্পর্ক তো কখনও রাশিয়ার সঙ্গে। এসব সত্ত্বেও যখন দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হয়, বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে বিপদজনক হয়ে ওঠে, সাধারণ মানুষের মনে সরকারের প্রতি ক্ষোভ তৈরি হয়, তখন সরকারের হাতে বাঁচার দুটি তাস জাতীয়তাবোধ ও বহিঃশত্রু দ্বারা দেশের সীমান্ত সংকটের প্রচার। পাতিরাম পতিতুণ্ডুর উদ্বোধনী ভাষণে এইসব বক্তব্য উঠে আসে। গাইড ও ঘোষকের জবানিতে নাটককার যে গান বসিয়েছেন তাতেও সরকারের এই দিকগুলো শানিত ভাষায় আক্রমিত—

'লোকে কেন পায়না খেতে, আগে বলত—চীন
এসব শুনে স্যামু চাচা ছাড়ত অনেক ঋণ!
মেঘগুলো সব ডাকছে কেন, কেন এমন খরা?
জবাব ছিল সহজ অতি, চীনই অমনতরা!
এসব বলে স্যামুচাচার চাটতো গিয়ে পা—
দিন বদলের দিনগুলোতে ওসব ভুলে যা!
...
এখন—রুশের সঙ্গে চুক্তি, দুই শেয়ালের যুক্তি
উঠবে যেথায় বিরোধিতার ঝান্ডা।
সমাজবাদের মুখোশ এঁটে, সাম্যবাদের বাটনা বেঁটে
লাগাও জোড়ে প্রগতিশীল ডাণ্ডা।'[৪৪]

লাশের প্রদর্শনীতে তিনটি লাশের প্রথম লাশ একজন গেঁয়ো চাষী রমজান মিয়ার। যাকে মারা হয়েছিল ১৯৭৩ এর ১৫ ই আগস্ট। সে কীভাবে লাশে পরিণত হয় সে কথা তার মুখ দিয়েই নাটককার বলিয়েছেন। নারকেল বেরিয়ার জোতদার শিব মুখার্জি রমজানকে বাধ্য করে তার উৎপাদিত সমস্ত ধান কর্জ হিসেবে দিতে। কিন্তু সে দুভাগের বেশি দিতে রাজি না হলে গত ছয় বছরের মিথ্যা ঋণের বোঝা চাপানো হয়। কিন্তু সেই ঋণ রমজান স্বীকার না করলেও তাকে বাধ্য করে তা স্বীকার করতে। এ ক্ষেত্রে জোতদার শিব মুখুজ্জের প্রধান সহায় হয়েছে দারোগা। সাতের দশকে নকশাল আন্দোলনের মাধ্যমে যে মুক্তির দশকের ডাক দিয়েছিল একদল সাধারণ মানুষ, 'শ্রেণিশত্রু খতম'-এর মাধ্যমে জমি দখলের লড়াই চালিয়েছিল কৃষকরা। সেই আন্দোলন ১৯৭২-১৯৭৩ সাল নাগাদ সরকারের উদ্যোগে পুলিশি অভিযানের মাধ্যমে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই শিব মুখার্জী অতি দর্পের সঙ্গে বলে—

> '...এটা তিয়াত্তরের সাল, তোর সত্তরের দশক উল্টায়ে গেছে রে। চাকা আবার আমাদের হাতে...।'[৪৫]

সুতরাং ধান দিতে সে বাধ্য। তারপরও সে রাজি না হলে 'পাকিস্তানী গুপ্তচর' বলে মিথ্যা অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী জীবনে তার কী হল সে কথা তার সংলাপেই দেখা যাক—

> 'আমারে ফাটকে পোর্‌লো। আটমাস বাদে যখন ঘরে ফিরলাম, তখন—ঘর আমার গোরস্থান, দু-দুটো ছাওয়াল না খেতি পেয়ে মরেছে, বিবিটা যে কোথায় চলি গেল, ভিটে মাটি পর্যন্ত ঐ বাবুর দখলে। গেরামে কেউ কাজ দিল না।...শহরে আলাম। বাবু—একডা কাজ দেবে, যে কোনো একডা কাজ, দাও না বাবু—কেউ দিলো না। কোথাও কাজ নাই। অথচাগুন জ্বলছে প্যাটে, দগ্ধে দগ্ধে মারে—তখন একটা পয়সা দেবে বাবু—দু'দিন কিছু খাইনি—ও বাবা একডা পয়সা, বড় খিদে গো, ওমা—মা একটু ফ্যান।'[৪৬]

এভাবেই ধীরে ধীরে রমজান মিঞার মতো কত শত চাষি নিত্যদিন শোষণের ফলে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ছে, লাশে পরিণত হচ্ছে। অথচ তার কোনও পরিসংখ্যান নেই।

পরের লাশ হারানচন্দ্র মাঝির—একজন শ্রমিকের। ১৯৭২-এ এই শ্রমিক মারা যায়। এই লাশের গল্প বলার আগে গাইড দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

‘এবার দেখুন এই সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকের লাশ কীভাবে জাতীয়তাবাদের কড়াইয়ে সেদ্ধ হয়।’[৪৭]

সমাজতান্ত্রিক দেশের মূল স্তম্ভই শ্রমিক। তাদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অথচ ইন্দিরা গান্ধির সমাজতন্ত্রে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারখানায় লক-আউট, শ্রমিকরা সব কর্মহারা। মূল্যবৃদ্ধিতে সংসার চালানোর দায়। লক-আউট বা ক্লোজার বাজারে কারখানাজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করার এক কৌশল। শ্রমিকের কথায়—

‘...প্রচুর মাল জমে রয়েছে বাজারে, মালের চাহিদাও কমেছে—তাই কারখানা বন্ধ রেখে মালের দাম চড়িয়ে দিয়ে আসতে আসতে জমানো মাল বাজারে ছাড়বে।’[৪৮]

ফলে বেতন বৃদ্ধি, বোনাস, লক-আউট, ক্লোজারের জন্য শ্রমিকরাও ঘেরাও ধর্মঘট শুরু করে। এখানে আর একটা দিক উঠে এসেছে—ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিক নেতারাও মালিকপক্ষের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে শ্রমিকদেরই ক্ষতি করছে। তারাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিক আন্দোলনকে মজবুত হতে দেয়নি। সেই সব নেতাদের কথায় শ্রমিকরা আন্দোলনে নামে এবং কিন্তু আন্দোলন চালানোর খরচের কোনও বন্দোবস্ত করে না। ফলে খরচ জোগাতে শ্রমিকরা চাঁদা চাই পথে ঘাটে। পরবর্তীতে তাদের জীবন কোন পথে যায় তা হারাণচন্দ্র মাঝির কথাতেই শোনা যাক—

‘অনেকেই আমায় দেখেছেন—ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, পাড়ায় পাড়ায়—হাতে এই চাঁদার কৌটা নিয়ে—ধর্মঘটি শ্রমিকের সাহায্য করে যান দাদারা, ধর্মঘটি শ্রমিকদের দুটো পয়সা দেবে গো বাবা...ঘরে সাতটি প্রাণী বাবারা—এক মুঠো চাল দেবে গো মা—তিনদিন কিছু খাইনি, বাবারা—ছেলেটা না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে বাবা, দুটো পয়সা দেবে ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, বৌটা গলায় দড়ি দিয়েছে মা, দুটো বাসী রুটি দেবে গো—দারুণ খিদে...।’[৪৯]

এভাবেই শ্রমিকের লাশ বানানোর কথা বলেছেন নাটককার। প্রথমে কারখানায় লক-আউট, ক্লোজার, ছাঁটাই করে একটি শ্রমিককে ভিখিরি বানিয়ে লাশে পরিণত করা হয়। ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের উপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন নাটককার। পতিতুণ্ডু বলেছে—

'ব্যাঙের ছাতার মতো এদেশে ইউনিয়ন গজায়, আর বিষ্ঠার পোকার মতো কিলবিল করে শ্রমিক দরদী বাবু নেতারা।'[৫০]

শেষ লাশটি একটি গ্রাজুয়েট বেকার সুমিত মিত্রর। যে মারা যায় ১৯৭১ সালে। স্কুল জীবন থেকে সে পড়ে ও জেনে এসেছে পৃথিবী বৃহত্তম গণতন্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ, রাজনীতি অতি নোংরা জিনিস তাই সেখান থেকে দূরে থাকা উচিত ইত্যাদি। সুমিত মিত্রর শখ ছিল এম. এস. সি. পাস করে গবেষণার জন্য বিলাত যাবে। তার বাবা ছিল একজন কেরানি, অবসর গ্রহণ করলে তার স্বপ্নপূরণ হয় না, তার বাড়িতে দুটি বোন। অগত্যাই সে হন্যে হয়ে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু সেখানে দেখে এতদিনে তার শিক্ষা ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স হওয়া সত্ত্বেও সে কোথাও কাজ পায় না। কারণ সে কাজ চাইতে গেলে কোথাও তাকে টাইপিং কোথাও ইলেকট্রিক এর কাজ জানে কিনা জানতে চাওয়া হয়। পরবর্তীতে সে সমস্ত কিছু শিখলেও তার কাজ জোটে না। তার বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, বোনগুলো বিপথে চলে যাচ্ছে, ভাইগুলো সমাজবিরোধী কাজে যুক্ত হচ্ছে—এসব সত্ত্বেও সে আত্মহত্যা করেনি। কারণ তার কথায়—

'না, আমি মরবো না। এখন জামানা পালটে গেছে। এটা একাত্তর সাল, একাত্তর সালে কেউ গলায় দড়ি দিয়ে মরে না, বিষ খায় না, আমি হাতে তুলে নেব গোলাপ ফুলের মতো বোমা, রাজদণ্ডের মতো পাইপগান—'।[৫১]

সুমিত মিত্রর মতো অসংখ্য ছাত্রের দুর্বার পদক্ষেপে সঙ্গ দিয়েছিল রমজান মিয়ার মতো কৃষকরা, হারানচন্দ্র মাঝির মতো শ্রমিকরা। তৈরি হয়েছিল নকশাল আন্দোলন। শোষিত, অবহেলিত, অবদমিত মানুষরা বাঁচার আশা পেয়েছিল। সুতরাং তাদেরকে দমন না করলে শাসককুলের ভবিষ্যতে সংশয়। সেজন্য অবশেষে নকশাল আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য শাসক অবলম্বন করে হিংসাত্মক পন্থা। তাই পতিতুণ্ড বলে—

'অহিংস পদ্ধতিতে মৃতদেহ উৎপাদন যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা সৃষ্টি করি—বারাসাত, বেলেঘাটা, বরাহনগর।'[৫২]

থানার লকাপে খুন, জেলের ভিতরে খুন, রাস্তাঘাটে খুন করে সেই আন্দোলন থামিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ নেয় সরকার। কিন্তু বিপ্লব কখনো শেষ হয় না। জনগণের বিপ্লব সাময়িক স্তব্ধ হলেও তা চিরকালের মতো থেমে থাকে না। নাটককার এই আশা পোষণ করেন। সেজন্যই নাটকের শেষে অভিনেতা বলে—

'...আমার ভারতবর্ষ যেন আলোকোজ্জ্বল বিরাট এক লাসবিপণি, শো-কেসে শো-কেসে আপনার আমার মতো মৃতদেহের স্তূপ—তবু এই দুঃসময়েও স্পষ্ট দেখি—এমন একদিন আসবে যেদিন এই ঘুমন্ত নিঃস্পৃহ ভিসুভিয়াস ফেটে পড়বে দুর্বার ক্রোধ আর ঘৃণায় (ক্রমশ একটা মিছিল এগিয়ে আসতে থাকে) ভেঙে দেবে স্পর্ধিত অত্যাচারের এই পণ্যশালা লাসবিপণি! আর সেই আশাতেই বুকের পাঁজর ঘ'সে শাণিত করি নর্মম জিঘাংসার উন্মুক্ত তরবারি! (মিছিলটা আক্রমণের ভঙ্গিতে স্থির হয়ে যায়)'[৫৩]

**সংগ্রাম :**

রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অসিত ঘোষ রচনা করেন 'সংগ্রাম' (১৯৭৬) একাঙ্কটি। ১৯৭৩ সালে চিলিতে সেনা-অভ্যুত্থান এবং সমসময়ে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ ও সরকার পোষিত গুন্ডাদের সন্ত্রাস—এই দুটি স্বৈরাচারী ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটকের পটভূমি রচিত। দেশ-কালের সীমারেখায় ফ্যাসিবাদের যে কোনও চরিত্রগত পরিবর্তন নেই সেই ভাবনায় সমগ্র নাটকজুড়ে প্রকাশ পেয়েছে।

নাটকের কাহিনি শুরু হয়েছে চিলির এক প্রফেসর কনস্তানজোর বাড়ি থেকে। কনস্তানজো কার্লোর বাবা। কার্লো একজন কমিউনিস্ট সদস্য। এসময় সারা চিলি জুড়ে সন্ত্রস্ত পরিবেশ, প্রতিনিয়ত সামরিক অভিযান চলছে, রাজনৈতিক মদতপুষ্ট গুন্ডারা লাগাম ছাড়া অত্যাচার চালাচ্ছে, দেশের কমিউনিস্ট ও মুক্তমনারা গৃহছাড়া। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কার্লো তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসে। কিন্তু সেই খবর গোপন থাকে না। অবিলম্বেই সামরিক অফিসার এবং তাদের সহযোগী পার্টি 'পত্রিয়া ই লেবারাতাদ'-এর একজন যুব সদস্য (আসলে গুন্ডা) সেখানে উপস্থিত হয়। তাদের আসার পূর্বেই কার্লো সেখান থেকে পালিয়েছিল। ফলে তার বর্তমান ঠিকানা কোথায় তা বলার জন্য কনস্তানজো চাপ দেয়, তাতে কিছু লাভ না হলে জোরপূর্বক অফিসার বাড়ি সার্চ করতে অগ্রসর হয়। এর পরেই নাটকের কাহিনি এসে পড়ে সাতের দশকের কলকাতার পটভূমিতে। অনুরূপ ঘটনা এখানেও ঘটেছে। কার্লো হয়েছে অমর সান্যাল। রাত্রের অন্ধকারে অমর বাড়িতে বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসে। চারিদিকে সন্ত্রস্ত বাতাবরণ, রাজ্যে চলছে সিদ্ধার্থশঙ্করের

আমল, পুলিশ ও কংগ্রেসি গুন্ডারা নিজেদের নৈরাজ্য কায়েম করেছে, কমিউনিস্টরা এলাকাছাড়া হয়েছে। অমর একজন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তাকে গুম-খুন করতে পুলিশ ও গুন্ডা উভয়েই তৎপর। সেই কথা ভেবে অমরের বাবা আতঙ্কগ্রস্ত, কারণ এর আগে তার একমাত্র মেয়ের স্বামী কমিউনিস্ট পার্টি করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। সুতরাং সে আর তাকে হারাতে চায় না। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি; শেষপর্যন্ত অমর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং খুন হয়।

**নাজি '৭৪ :**

সাতের দশকের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পটভূমিতে রচিত অসিত ঘোষের *'নাজি '৭৪'* নাটকটি প্রথম শৌভনিক নাট্যদল ১৯৭৫ সালে মঞ্চস্থ করে। তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত এই নাটকটিতে ধরা পড়েছে সাধারণ মানুষের ওপর কংগ্রেসি গুন্ডা ও পুলিশি নির্যাতন, সাধারণ মানুষের অসহায়তা, কমিউনিস্ট আন্দোলন ও তা দমনে সরকারি গুন্ডা ও পুলিশের একাত্মতা ইত্যাদি। যা ছিল সাতের দশকের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির একটি বাস্তব চিত্র।

নাটকটির কাহিনিবৃত্ত আবর্তিত হয়েছে একটি রেলস্টেশনের মধ্যে এবং এর পটভূমি রচিত হয়েছে ১৯৭৪ সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা। ১৯৭৩ সালের ৩ মার্চ 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়-

> 'চুরি, গুন্ডামি, ছিনতাই এখন ব্যাপক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিশেষ করে শহরতলি এলাকায়। সন্ধ্যের পর লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের কী পরিমাণ সন্ত্রস্ত হয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়, তার কিঞ্চিৎমাত্র বিবরণ সংবাদপত্রে নিত্যদিন পাওয়া যায়।'[৫৪]

এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই অসিত ঘোষ নাটকটি রচনা করেন, সেই সঙ্গে তৎকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গ চরিত্রগুলির পারস্পরিক সংলাপে উঠে আসে। মূল কাহিনি শুরুর আগেই (তখনও পর্দা ওঠেনি) নাটকের একটি চরিত্র (যে পেশায় রেল-পুলিশ) অধীর হালদারের দীর্ঘ বক্তব্যে শোনা যায়—

'...বর্তমানে র‍্যালে ভ্রমণ নাকি খুবই বিপজ্জনক। ছিনতাই, ডাকাতি মাইয়াচেলেদের শালীনতা হানি খুবই বাইড়া গেছে। আইচ্ছা আপনারাই কনতো, দেশের বেবাক চোর, গুন্ডা, ডাকাইত, বদমাশগুলান যদি ভদ্রলোক বইন্যা যায়, তাইলে এই বেকারীর যুগে আরও বেকার সংখ্যা বাড়বো না?'[৫৫]

এই বক্তব্যের মাঝেই একটি ঘটনা ঘটে যা নাটকের মূল কাহিনির গতি নির্দেশ করে। তাজা ও পঞ্চা নামে দুই গুন্ডা, তার উপর বর্তমানে রাজ্যের যুবনেতা, একটি লোকের মাস মাইনে ছিনতাই করে রেল পুলিশের সামনে; কিন্তু রেল পুলিশ তাতে কোনও বাধা দেয়নি। নাটকটি এভাবেই শুরু শুরু হয়েছে। কারও বুঝতে বাকি থাকল না পরবর্তী কাহিনি কোন দিকে এগোবে।

নাটকের মূল কাহিনিতে দেখা যায়, ট্রেনের অপেক্ষায় মধ্যরাত্রে কয়েকজন স্টেশনের প্রতীক্ষালয়ে বসে আছে। সেখানে রয়েছে অজয়, অশোক, প্রৌঢ়, স্বামী-স্ত্রী, শ্রমিক ও শিক্ষক। এরাই নাটকের মূল চরিত্র। বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে তারা আতঙ্কিত। কারণ রাজনৈতিক মদতে সমাজবিরোধী লোকেদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে তারা ভয় পায়। পুলিশ-প্রশাসনও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না—সে কথা তাদের অবিদিত নয়। তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়েই ধরা পড়ে সেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। একে-অপরের পরিচয় আদান-প্রদানের মধ্যে জানা যায় অজয়ের দিদির স্বামী ১৯৫৭ সালে খাদ্য-আন্দোলনে শামিল হতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে এবং তার ভাই নকশাল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার দরুন পুলিশের হাতে খুন হয়েছে। শিক্ষকের ছেলে প্রদীপ্ত বামপন্থী (সি. পি. এম.) রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। শিক্ষক আজ তার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জানে পুলিশ তাকে জেলের ভিতর গুলি করে হত্যা করেছে। এর কারণ হিসেবে পুলিশ বয়ান দিয়েছে, সে নাকি জেল টপকে পালাতে গিয়েছিল। বর্তমানে শিক্ষকের পরিবারে অর্থকষ্টও রয়েছে ব্যাপক। কারণ ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে স্কুল কমিটি শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে এই বলে যে তার নাকি যথেষ্ট দেশপ্রেম নেই; অথচ ১৯৭২ সালে ভারত সরকার তাকে প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী হওয়ার জন্য তাম্রপত্র দিয়েছে। এরকম পরিস্থিতিতে তাজা ও পঞ্চা সেখানে এসে হাজির হয়, সকলের সামনে মদ্যপান করে এবং তাদের

সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, স্ত্রীর দিকে কুনজর দেয় এবং অভব্য আচরণ করে। স্বামী অবস্থার জটিলতা বুঝে পুলিশকে খবর দেওয়ার কথা প্রকাশ করলে প্রৌঢ় পুলিশের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে বলে—

> 'পুলিশের ভরসা করবেন না। ভারতের সশস্ত্র শান্তির রক্ষকরা প্রায়শই নিরপরাধদের গ্রেপ্তার করে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে।'[৫৬]

তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। প্রত্যেকটি যাত্রীকে মারধর করে, যাবতীয় টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়। শিক্ষককে মেরে রক্তাক্ত করে দেয়। তখন শিক্ষকের ইলিউশনে ভেসে আসে রোমান পোশাক পরিহিত ব্রুটাস। ব্রুটাস বলে উঠে—

> 'সেই জুলিয়াস সীজার থেকে শুরু করে হিটলার মুসোলিনীর দল আজও বেঁচে আছে। ওদের প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই বারংবার ওদের আঘাতে তোমরা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছো।'[৫৭]

সময়ের এই জটিল পরিস্থিতিতে তাজা ও পঞ্চারাই হয়েছে দেশের নেতা। পুলিশের বেষ্টনীর মধ্যে থেকে নির্দ্বিধায় তারা সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে পারে। এরকম এক যুবনেতার পরামর্শেই পুলিশ অজয়ের ভাই অমরকে মধ্যরাতে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং রাত্রের অন্ধকারে নিভৃত স্থানে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

এই নাটকটির মধ্যে নাটককার ফ্যাসিবাদী শক্তির আগ্রাসী রূপ তুলে ধরেছেন। সে প্রসঙ্গে বারবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ টেনে এনে ১৯৭৪ সালের পশ্চিমবঙ্গের শাসকের চরিত্রের সঙ্গে জুলিয়াস সীজার, মুসোলিনি, হিটলারের মিল খুঁজেছেন। দেখিয়েছেন দেশ-কালের সীমারেখার ব্যবধানে ফ্যাসিবাদের চরিত্রের কোনও পরিবর্তন হয় না। বর্তমান ভারতবর্ষে সেরকমই এক শক্তির উদয় হয়েছে, যাকে পরাস্ত করা একান্তই প্রয়োজন।

**তথ্যসূত্র :**


১. ভট্টাচার্য, হীরেন (সম্পা.); *গণনাট্য,* ত্রয়োদশ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, মে-জুলাই ১৯৭৭, পৃ-২৬-২৭

২. দত্ত উৎপল; *ব্যারিকেড,* উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২

৩. তদেব, পৃ-২২২

৪. তদেব, পৃ-২২৬

৫. তদেব, পৃ-২২৮

৬. তদেব, পৃ-২৩৩

৭. তদেব, পৃ-২৫৬

৮. তদেব, পৃ-২৫৯

৯. তদেব, পৃ-২৬৭

১০. তদেব, পৃ-২৬৯

১১. তদেব, পৃ-২১৬

১২. দত্ত উৎপল; *দুঃস্বপ্নের নগরী,* উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৩, পৃ-৭৮

১৩. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশনারি থিয়েটার,* নীহাররঞ্জন বাগ (অনু.), নাট্যচিন্তা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ-১২১

১৪. সেন, শোভা; *স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ,* এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ-১১৭

১৫. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশনারি থিয়েটার,* প্রাগুক্ত, পৃ-১২১

১৬. সেন, শোভা; *স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ,* প্রাগুক্ত, পৃ-১১৭,

১৭. সাহা নৃপেন্দ্র (সম্পা.); *উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন,* উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ-৩৫

১৮. দত্ত, উৎপল; *টুওয়ার্ডস আ রেভলিউশনারি থিয়েটার,* প্রাগুক্ত, পৃ-১২২

১৯. তদেব, পৃ-৩৪

২০. দত্ত উৎপল; *দুঃস্বপ্নের নগরী,* উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৩, পৃ-৭৯

২১. দত্ত উৎপল; *ভূমিকা,* উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪২৩, পৃ-[১৮]

২২. দত্ত উৎপল; *দুঃস্বপ্নের নগরী,* প্রাগুক্ত, পৃ-৮৭

২৩. তদেব, পৃ-৮৭

২৪. তদেব, পৃ-১০১-১০২

২৫. তদেব, পৃ-১০৭

২৬. তদেব, পৃ-১০৮

২৭. তদেব, পৃ-১৩১-১৩২

২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতেশ; *হে সময়, উত্তাল সময়,* নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ-২৭৯

২৯. তদেব, পৃ-২৭৯

৩০. সরকার বাদল; *ভয়েজেস ইন দা থিয়েটার,* ঋতদীপ ঘোষ (অনু.), নাট্যচিন্তা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১২, পৃ-৬২

৩১. সরকার বাদল; *মিছিল,* নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২, পৃ-২১১

৩২. তদেব, পৃ-২১৫

৩৩. সরকার বাদল; *ভয়েজেস ইন দা থিয়েটার,* প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩

৩৪. সরকার বাদল; *মিছিল,* পৃ-২২২

৩৫. তদেব, পৃ-২২২

৩৬. তদেব, পৃ-২২৫

৩৭. তদেব, পৃ-২৩১

৩৮. তদেব, পৃ-২৩৪

৩৯. সরকার, বাদল; *বাসি খবর,* নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা,দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২, পৃ-৫০৭-৫০৮

৪০. রায়, অমল; *লাসবিপাণি,* বজ্রনির্ঘোষের নাটক, উবুদশ, কলকাতা, ২০০৪, পৃ-৮৬

৪১. তদেব, পৃ-৮৬

৪২. তদেব, পৃ-৬০

৪৩. তদেব, পৃ-৬১

৪৪. তদেব, পৃ-৬৫

৪৫. তদেব, পৃ-৭২

৪৬. তদেব, পৃ-৭৩

৪৭. তদেব, পৃ-৭৩

৪৮. তদেব, পৃ-৭৪

৪৯. তদেব, পৃ-৭৭

৫০. তদেব, পৃ-৭৮

৫১. তদেব, পৃ-৮৩

৫২. তদেব, পৃ-৮৪

৫৩. তদেব, পৃ-৮৫-৮৬

৫৪. দাস অরূপ কুমার (সং. ও সম্পা.); *গণযুগের দিনপঞ্জি (১৯৬০-১৯৭৯)*, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০২, পৃ-৫৩

৫৫. ঘোষ, অসিত; *নাজি'৭৪,* নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা.), গ্রুপ থিয়েটার, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ-১৬৩

৫৬. তদেব, পৃ-১৭১

৫৭. তদেব, পৃ-১৭৬